এ ক্ষেত্রে خاتم النبيين বিশেষণ সংযোজনের ফলে এ বিষয়টাও একেবারে পরিষ্কার হয়ে গেল যে, নবীজী যেহেতু সমগ্র উম্মতের জনকের মর্যাদায় ভূষিত, সুতরাং তাঁকে অপুত্রক বলে আখ্যায়িত করা নির্বুদ্ধিতা বৈ কিছুই নয়। কেননা خاتم النبيين শব্দদ্বয় একথাও ব্যক্ত করে দিয়েছে যে, পরবর্তীকালে কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী গোটা মানবকুলই তাঁর (নবীজীর) উম্মতভুক্ত। তাই তাঁর উম্মতের সংখ্যা অন্যান্য উম্মতের চাইতে অনেক বেশী হবে। ফলে নবীজী (সা)-র আধ্যাত্মিক সন্তানও অন্যান্য নবীগণের চাইতে বেশি হবে। خاتم النبيين বিশেষণটি একথাও বোঝাচ্ছে যে, সমগ্র উম্মতের প্রতি হযরতের (সা) স্নেহ-মমতা অন্যান্য নবীগণের তুলনায় অধিকতর হবে। তাঁর পরে কোন ওহী বা নবীর আগমন হবে না বলে তিনি কিয়ামত পর্যন্ত উদ্ভূত যাবতীয় সমস্যার সমাধান ও যাবতীয় প্রয়োজন মেটাবার পথ বাতলে দিয়েছেন। পক্ষান্তরে পূর্ববর্তী নবীগণের একথা ভাবতে হতো না, কেননা তাঁরা জানতেন যে, জাতির মাঝে গোমরাহী ও বিভ্রান্তি প্রসার লাভ করলে তাঁদের পর অন্যান্য নবী আবির্ভূত হয়ে এসবের সংশোধন ও সংস্কার সাধন করবেন। কিন্তু খাতামুল আম্বিয়ার (সা) এ কথাও ভাবতে হতো যে, কিয়ামত পর্যন্ত উম্মত যে বিভিন্নমুখী অবস্থা ও সমস্যার সম্মুখীন হবে সেগুলো সম্পর্কে উম্মতকে প্রয়োজনীয় পথনির্দেশ তাঁকেই দিতে হবে। যে সম্পর্কে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র বিভিন্ন হাদীস সাক্ষ্য প্রদান করে যে, তাঁর পর অনুসরণযোগ্য যেসব ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটবে তাঁদের অধিকাংশের নামই তিনি উল্লেখ করে দিয়েছেন। অনুরূপভাবে ভবিষ্যতে অন্যায় ও অসত্যের যত পতাকাবাহীর প্রাদুর্ভাব ঘটবে ওদেরও যাবতীয় লক্ষণ, অবস্থা ও তথ্যাদি এমন স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে দিয়েছেন যেন একজন সাধারণ চিন্তাশীলেরও এ সম্পর্কে কোন সন্দেহের অবকাশ না থাকে। এ কারণেই রসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেছেন যে, আমি তোমাদের জন্য এমন উজ্জ্বল ও জ্যোতিষ্মান পথ রেখে গেলাম যেথায় দিবারাত্রি দুটোই সমান—কখনো পথভ্রষ্ট হওয়ার আশংকা নেই।

এ আয়াতে একথাও প্রণিধানযোগ্য যে, উপরে হুযুর (সা)-এর উল্লেখ 'রসূল' বিশেষণে করা হয়েছে। এজন্য বাহ্যত خاتم المرسلين বা خاتم الرسل শব্দের ব্যবহার অধিক যুক্তিসংগত ছিল বলে মনে হয়। অথচ কোরআনে হাকীম তদস্থলে خاتم النبيين শব্দ গ্রহণ করেছে।

কারণ এই যে, অধিকাংশ আলিমের মতে নবী ও রসূলের মাঝে পার্থক্য শুধু একটাই—তা এই যে, নবী সেসব ব্যক্তি, যাঁদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা সৃষ্টিকুলের পরিশুদ্ধি ও সংস্কার সাধনের জন্য প্রেরণ করেছেন এবং তাঁদের প্রতি ওহী নাযিল করে ধন্য করেছেন, চাই তাঁদের জন্য কোন স্বতন্ত্র আসমানী গ্রন্থ ও স্বতন্ত্র শরীয়ত নির্ধারিত হয়ে থাকুক—অথবা পূর্ববর্তী কোন নবীর গ্রন্থ ও শরীয়তের অনুসারীগণের হিদায়তের জন্য

আদিষ্ট হয়ে থাকুক--যেমন হযরত হারুন (আ) হযরত মূসা (আ)-র গ্রন্থ ও শরীয়তের অনুসারীগণের হিদায়তের জন্য আদিষ্ট হয়েছিলেন।

অপরপক্ষে 'রসূল' শব্দটি বিশেষভাবে ঐ নবীর প্রতি প্রযোজ্য, যাঁকে স্বতন্ত্র গ্রন্থ ও শরীয়ত প্রদান করা হয়েছে। অনুরূপভাবে 'রসূল' শব্দের চাইতে 'নবী' শব্দের মর্মার্থে ব্যাপকতা অধিক। সুতরাং আয়াতের মর্মার্থ এই যে, তিনি (সা) নবীকুলের আগমন ধারা সমাপ্তকারী এবং সর্বশেষ আগমনকারী। চাই তিনি স্বতন্ত্র শরীয়তের অধিকারী নবী হোন বা পূর্ববর্তী নবীর অনুসারী হোন। এ দ্বারা বোঝা গেল যে, আল্লাহ্ পাকের নিকটে যত প্রকারের নবী হতে পারেন তাঁর (নবীজী) মাধ্যমে এঁদের সবার পরিসমাপ্তি ঘটলো। তাঁর পরে অন্য কোন নবী প্রেরিত হবেন না।

ইমাম ইবনে কাসীর স্বীয় তফসীরে ফরমান ঃ

فهذه الاية فى انه لا نبى بعده وازا كان لا نبى بعده فلا رسول بالطريق الاولى لان مقام الرسالة اخص من مقام النبوة فان كل رسول نبى ولا ينعكس بذالك وردت الاحاديث المتواترة عن رسول الله (صلعم) من حديث جماعة من الصحابة -

অর্থাৎ এ আয়াত এ আকীদার পক্ষে স্পষ্ট প্রমাণ যে, তাঁর পরে কোন নবী নেই এবং যখন কোন নবী নেই তখন রসূল থাকার প্রশ্নই উঠে না। কেননা 'নবী' ব্যাপক অর্থবোধক এবং 'রসূল' শব্দটি বিশিষ্টতা জ্ঞাপক। এটা এমন এক আকীদা, যার সমর্থন-সূচক বহুসংখ্যক প্রামাণ্য হাদীস রয়েছে যা সাহাবায়ে কিরামের এক বিরাট জামাতের দ্বারা বর্ণিত হয়ে আমাদের পর্যন্ত পৌঁছেছে। এ আয়াতের শব্দগত বিশ্লেষণ খানিকটা বিস্তারিতভাবে এ জন্য করা হয়েছে যে, আমাদের দেশে নবুয়তের দাবীদার গোলাম আহমদ কাদিয়ানী এ আয়াতকে স্বীয় হীন উদ্দেশ্য সাধনের পথে অন্তরায় মনে করে এর তফসীরে নানাবিধ বিকৃতি ও মনগড়া সম্ভাব্যতা উদ্ভাবন করেছে। উপরোল্লিখিত বক্তব্যের মাধ্যমে আলহামদুলিল্লাহ---এগুলোর উত্তর হয়ে গেছে।

**খতমে-নবুয়তের মাস'আলা ঃ** রসূলুল্লাহ্ (সা)-র নবীকুলের আগমনধারার পরিসমাপ্তকারী হওয়া, তাঁর সর্বশেষ নবী হওয়া, তাঁর পরে আর কোন নবী প্রেরিত না হওয়া এবং প্রত্যেক নবুয়তের দাবীদার মিথ্যাবাদী ও কাফির প্রতিপন্ন হওয়া---এমন এক মাস'আলা যে সম্পর্কে প্রত্যেক যুগের মুসলমানগণ ঐক্যবদ্ধ ও অভিন্ন মত পোষণ করে আসছেন। সুতরাং এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার কোন প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু কাদিয়ানী সম্প্রদায় এ সম্পর্কে মুসলমানদের মনে সন্দেহ ও বিভ্রান্তি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে প্রাণান্তকর চেষ্টায় রত। তারা শত শত পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশ করে অশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত মানুষকে পথভ্রষ্ট করতে প্রয়াস পাচ্ছে। সুতরাং আমি এ মাস'আলার বিশদ আলোচনা পূর্ণ 'খতমে-নবুয়ত' নামে এক স্বতন্ত্র কিতাব লিখেছি। যাতে একশত আয়াত,

দু'শতাধিক হাদীস এবং পূর্ববর্তী মুসলিম মনীষিগণের অসংখ্য উক্তি ও উদ্ধৃতির মাধ্যমে এ মাস'আলা বিস্তারিত ও সুস্পষ্ট বিশ্লেষণ করেছি এবং কাদিয়ানীদের দ্বারা সৃষ্ট অমূলক সন্দেহাবলীর যথোপযুক্ত উত্তর দিয়েছি। এখানে সেগুলো থেকে কয়েকটি প্রয়োজনীয় কথা উল্লেখ করা হচ্ছে।

**তাঁর খাতামুন্নাবিঈন হওয়া শেষ যমানায় হযরত ঈসা (আ)-র পুনরাবির্ভাবের পরিপন্থী নয়ঃ** যেহেতু কোরআনে করীমের বেশ কিছু সংখ্যক আয়াত এবং প্রামাণ্য হাদীসসমূহ দ্বারা প্রমাণিত যে, শেষ যমানায় কিয়ামতের পূর্বে হযরত ঈসা (আ) পুনরায় দুনিয়াতে আবির্ভূত হবেন, দাজ্জালকে হত্যা করবেন এবং তদানীন্তন বিশ্বে বিরাজমান সকল প্রকারের গোমরাহীর মূলোৎপাটন করবেন, যার বিস্তারিত বর্ণনা আমি আমার التصريح بما تواتر فى نزول المسيح নামক পুস্তিকায় প্রদান করেছি।

কোরআন-হাদীসের অসংখ্য বাণী দ্বারা প্রমাণিত ও সমর্থিত হযরত ঈসা (আ)-র আকাশে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়ার এবং শেষ যমানায় তাঁর পুনরাবির্ভাবের কথা মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী সরাসরি অস্বীকার করে নিজেই প্রতিশ্রুত মসীহ্ বলে দাবী করেছে এবং প্রমাণ স্বরূপ বলেছে যে, হযরত ঈসা ইবনে মরিয়মের (আ) দুনিয়াতে পুনরায় আগমনের কথা যদি মেনে নেয়া হয় তবে এটা হযুর (সা)-এর خاتم النبيين হওয়ার পরিপন্থী হবে।

উত্তর একেবারে সুস্পষ্ট--- خاتم النبيين এবং সর্বশেষ নবী হওয়ার অর্থ আপনার পরে কোন ব্যক্তি নবী পদে অধিষ্ঠিত হবেন না। এ দ্বারা এ কথা বোঝা যায় না যে, তাঁর পূর্বে যাঁরা নবুয়ত প্রাপ্ত হয়েছেন তাঁদের নবুয়ত প্রত্যাহার করে নেওয়া হবে বা এ জগতে এঁদের কারো পুনরাবির্ভাব ঘটতে পারে না। অবশ্যই হযরত (সা)-র পরে তাঁর উম্মতের সংস্কার ও পরিশুদ্ধির উদ্দেশ্যে যিনিই আবির্ভূত হবেন, তিনি স্বীয় নবুয়ত পদে বহাল থেকে আঁ হযরতের (সা) প্রবর্তিত আদর্শ ও শিক্ষাদীক্ষার অনুসারী হয়েই এ উম্মতের পরিশুদ্ধি ও সংস্কারের দায়িত্ব পালন করবেন। যেমন সহীহ্ হাদীস-সমূহে পরিষ্কারভাবে বর্ণিত আছে। ইমাম ইবনে কাসীর এ আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে বলেনঃ

والمراد بكونه عليه السلام خاتمهم انقطاع حدوث وصف النبوة فى احد من الثقلين بعد تخليته عليه السلام بها فى هذه النشأة ولا يقدح فى ذالك ما اجمعت عليه الامة واشتهرت فيه الاخبار ولعلها بلغت مبلغ التواتر المعنوى ونطق به الكتاب على قول ووجب الايمان به واكفر منكره كالمسيح من نزول عيسى عليه السلام اخر الزمان. لانه كان نبيا قبل ان يحلى نبينا صلى الله عليه وسلم بالنبوة فى هذه النشأة -

অর্থাৎ রসূলুল্লাহ্ (সা)-র খাতামুন্নাবীঈনের অর্থ এই যে, তাঁর আবির্ভাবের পরে নবুয়ত পদের পরিসমাপ্তি ঘটবে। এখন আর কেউ এ গুণ ও পদের অধিকারী হবেন না। এ দ্বারা শেষ যমানায় হযরত ঈসা (আ)-র দুনিয়ায় পুনঃ অবতরণের মাস'আলা সম্পর্কে কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় না—যে সম্পর্কে গোটা উম্মত একমত, কোরআন পাকেও এ সম্পর্কে স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে এবং তাওয়াতুরের ( تواتر ) সমমর্যাদাসম্পন্ন হাদীসসমূহ এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট সাক্ষ্য প্রদান করছে। কেননা, তিনি এ জগতে আমাদের নবীজী (সা)-র পূর্বেই আবির্ভূত হয়েছিলেন।

**নবুয়তের মর্মার্থের বিকৃতি সাধন এবং ছায়া ও উপনবীত্ব পদের আবিষ্কার ঃ** এই নবুয়তের দাবিদার নবুয়ত দাবির পথ সুগম করার উদ্দেশ্যে দুরভিসন্ধিমূলকভাবে এক অভিনব প্রকারের নবুয়ত আবিষ্কার করেছে—কোরআন-হাদীসে যার কোন অস্তিত্ব ও প্রমাণ নেই। অতপর বললো যে, এ ধরনের নবুয়ত কোরআনে বর্ণিত খতমে-নবুয়ত বিষয়ের পরিপন্থী নয়। যার সারকথা এই যে, সে নবুয়তের মর্মার্থ বিশ্লেষণে হিন্দু ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের মাঝে প্রচলিত পথ অনুসরণ করেছে—তা এই যে, কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তির জীবদ্দশাতেই পরবর্তী ব্যক্তির রূপে আত্মপ্রকাশ করতে পারে। এ প্রসঙ্গে সে আরো বলে যে, যে ব্যক্তি নবীজীর পরিপূর্ণ অনুসরণের মাধ্যমে তাঁর ( নবীজীর ) রংগে রঞ্জিত হয়ে তাঁর রূপ পরিগ্রহ করেছে—তাঁর আগমন বস্তুত স্বয়ং নবীজী (সা)-র আগমন। প্রকৃত প্রস্তাবে সে তাঁরই ছায়া ও প্রতিভূ স্বরূপ। সুতরাং তার মতে তার এ দাবির কারণে খতমে-নবুয়তের আকীদা কোনভাবে প্রভাবান্বিত হয় না।

কিন্তু প্রথম কথা তো এই যে, ইসলামে নবাবিষ্কৃত এই নবুয়তের উদ্ভব কোথা থেকে হলো। এতদ্ভিন্ন যেহেতু খতমে-নবুয়তের মাস'আলা ইসলামী আকীদাসমূহের মধ্যে একটি মৌলিক বিষয়; তাই রসূলুল্লাহ্ (সা) বিভিন্ন সময়ে নানাভাবে এ মাস'আলা এমন স্পষ্টভাবে বিশ্লেষণ করে দিয়েছেন, যাতে কোন বিকৃতি সাধনকারীর পক্ষে এর অর্থে বিকৃতি ও ভুল ব্যাখ্যার কোন অবকাশই না থাকে। এই উত্তরের বিস্তারিত বর্ণনা আমার 'খতমে নবুয়ত' নামক পুস্তকে দ্রষ্টব্য। এখানে বিশেষ প্রয়োজনীয় কয়েকটি বিষয় আলোচনা করেই প্রসঙ্গের সমাপ্তি টানা হলো।

বুখারী, মুসলিম প্রভৃতি সমস্ত হাদীসগ্রন্থে সম্পূর্ণ নির্ভুল সনদের মাধ্যমে হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবীজী (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ

ان مثلى و مثل الانبياء من قبلى كمثل رجل بنى بيتا فاحسنه
واجمله الا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به و يعجبون
له و يقولون هلا وضعت هذه اللبنة و انا خاتم النبيين رواه احمد
والنساءى و الترمذى و فى بعض الفاظه فكنت انا سددت موضع اللبنة
وختم بى البنيان

অর্থাৎ "আমার ও আমার পূর্ববর্তী নবীগণের উপমা ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে অত্যন্ত দৃঢ়, সুসংবদ্ধ ও সৌন্দর্য মণ্ডিত করে একটি ঘর তৈরী করলো। কিন্তু সে ঘরের এক কোণে দেয়ালের একটি ইটের সমপরিমাণ জায়গা খালি রেখে দিল। অতপর মানুষ তা দেখতে সর্বক্ষণ আনাগোনা করতে থাকলো এবং এর নির্মাণ কৌশল ও পারিপাট্য দেখে সবাই চমৎকৃত ও বিস্ময়াভিভূত হলো; কিন্তু সবাই বলতে লাগলো যে, ঘরের মালিক এ ইটটি বসিয়ে নির্মাণ কাজের পূর্ণতা কেন সাধন করলো না? রসূলুল্লাহ্ (সা) ফরমান যে, নবুয়তের এই সুরম্য অট্টালিকার সর্বশেষ ইট আমি। কোন কোন হাদীসের শব্দ এরূপ যে আমি সে শূন্য জায়গা পূরণ করে নবুয়তরূপী প্রাসাদের পূর্ণতা সাধন করেছি।"

এই তত্ত্বপূর্ণ—তাৎপর্যবহ উপমার সারকথা এই যে, নবুয়ত এক বিশাল অট্টালিকা ও সুরম্য প্রাসাদের ন্যায়---মহান নবীগণ (সা)-এর স্তম্ভ স্বরূপ। নবীজী (সা)-র আবির্ভাবের পূর্বেই একটি ইটের সমপরিমাণ জায়গা ব্যতীত উক্ত নবুয়তের গোটা অট্টালিকার নির্মাণ কাজই সম্পন্ন হয়েছিল। হযরত (সা) এই খালি অংশটুকু পূরণ করে উক্ত প্রাসাদের নির্মাণ কাজের পরিপূর্ণতা সাধন করেন। সুতরাং নবুয়ত বা রিসালতের আর কোন অবকাশ নেই। এখন যদি কোন প্রকারের নতুন নবুয়ত বা রিসালতের আবির্ভাব ঘটে তবে নবুয়তরূপ প্রাসাদে এর সঙ্কুলান হবে না।

বুখারী, মুসলিম, মুসনাদে-আহমদ প্রমুখ হাদীসগ্রন্থে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত অপর এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) ফরমান ঃ

كانت بنوا سرا ئيل تسو سهم الا نبياء كلما هلك نبى خلفه نبى و انه لا نبى بعدى و سيكون خلفاء فيكثرون الحديث

অর্থাৎ বনী ইসরাঈলের রাজদণ্ড ও শাসন ক্ষমতা স্বয়ং নবীগণের হাতে ছিল। এক নবীর তিরোধানের পর আরেক নবীর আবির্ভাব ঘটতো। আমার পরে কোন নবী আসবেন না, অবশ্যই আমার প্রতিনিধিগণ ( খলীফা ) আসবেন—যাদের সংখ্যা হবে অনেক।

হযরত যেহেতু সর্বশেষ নবী, তাঁর পর কোন নবী প্রেরিত হবেন না—সুতরাং উম্মতের হিদায়তের কাজ কিভাবে সমাধা হবে—উপরোক্ত হাদীস সে কথাও ব্যক্ত করে দিয়েছে। এ প্রসংগে বলা হয়েছে যে, তাঁর পরে উম্মতের হিদায়ত ও শিক্ষাদীক্ষার ব্যবস্থা তাঁর খলীফা ( প্রতিনিধিগণের ) মাধ্যমে করা হবে। তাঁরা নবীজী (সা)-র খলীফারূপে নবুয়তের উদ্দেশ্যাবলী সম্পন্ন করবেন। যদি কোন প্রকারের 'ছায়া নবী' বা উপনবীর অবকাশ থাকত, অথবা কোন শরীয়তবিহীন নবীপদ অবশিষ্ট থাকত, তবে অবশ্যই এখানে তার উল্লেখ এভাবে থাকত যে, অমুক ধরনের নবুয়ত বাকী রয়েছে, যদ্দ্বারা বিশ্বের শাসনকার্য ও ব্যবস্থাপনা সম্পন্ন হবে।

এই হাদীসে স্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে যে, তাঁর (সা) পর কোন প্রকারের নবুয়ত বাকী নেই। বরং পূর্ববর্তী উম্মতসমূহের হিদায়তের দায়িত্ব যেরূপে নবীগণের মাধ্যমে পালন করা হতো অনুরূপভাবে এ উম্মতের হিদায়ত তাঁর ( নবীজীর ) খলীফাগণের সাহায্যে করা হবে।

মাসনাদে-আহমদ প্রমুখ হাদীসগ্রন্থে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা ও উম্মে কুর্‌য্ কাবিয়াহ (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) ফরমান ঃ

لا يبقى بعدى من النبوة شئ الا المبشرات قالوا يا رسول الله
وما المبشرات قال الرؤيا الصالحة يراها المسلم او ترى له

অর্থাৎ "আমার পরে মোবাশ্বেরাত ব্যতীত নবুয়তের কিছুই বাকী নেই। সাহাবাগণ আরয করলেন, ইয়া রসূলুল্লাহ্ (সা), মোবাশ্বেরাত ( مبشرات ) কি বস্তু? বললেন, সত্য স্বপ্ন---যা মুসলমান স্বয়ং দেখবে অথবা এ সম্পর্কে অপর কেউ দেখবে"।---( তিবরানী হাদীসটিকে সহীহ্ বলে মত প্রকাশ করেছেন )।

এ হাদীস কত স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছে যে, শরীয়তবহ বা শরীয়তবিহীন অথবা মির্জা কাদিয়ানীর মন্তব্যানুসারে ছায়া বা আনুষঙ্গিক কোন প্রকারের নবুয়তই বাকী নেই ; কেবলমাত্র মোবাশ্বেরাত বা সত্য স্বপ্নসমূহ থাকবে, যার মাধ্যমে মানুষ কিছু অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারবে।

মাসনাদে আহমদ ও তিরমিযী শরীফে হযরত আনাস বিন্ মালেক (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) ফরমান ঃ

ان الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدى ولا نبى

অর্থাৎ "নিশ্চয়ই আমার মাধ্যমে রিসালত ও নবুয়ত পদের পরিসমাপ্তি ঘটেছে ---আমার পরে অপর কোন নবী বা রসূলের আবির্ভাব ঘটবে না।"

এ হাদীস স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে দিয়েছে যে, তাঁর পর শরীয়তবিহীন নবুয়ত পদও বিদ্যমান নেই। ছায়া বা উপ নবুয়ত পদ বলে ইসলামে এমন কিছুর অস্তিত্বই নেই।

এ স্থলে খতমে নবুয়ত সংশ্লিষ্ট হাদীসসমূহ উদ্ধৃত করা উদ্দেশ্য নয়---দু'শতাধিক হাদীস 'খতমে নবুয়ত' নামক পুস্তিকায় একত্রিত করা হয়েছে। উদ্দেশ্য---কয়েকটি হাদীস দ্বারা কেবল একথাই ব্যক্ত করা যে, কাদিয়ানীরা নবুয়ত পদ বিদ্যমান থাকার পক্ষে যুক্তির অবতারণা করতে গিয়ে যে ছায়া বা উপনবী পদ আবিষ্কার করেছে--- ইসলামে এর কোন মূল্য ও ভিত্তি নেই। এমনটি আছে বলে যদি ধরেও নেওয়া হয়, তবুও উপরোক্ত হাদীসসমূহের দ্বারা একথা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, তাঁর (সা) পর কোন প্রকারের নবুয়তই বাকী নেই।

এজন্যই সাহাবায়ে-কিরাম থেকে আরম্ভ করে আজ পর্যন্ত প্রত্যেক যুগ ও স্তরের মুসলমানগণ এ সম্পর্কে একমত যে, হযরতের পর কেউ কোন প্রকারের নবী বা রসূল হতে পারে না---যে এমন দাবি করবে সে মিথ্যাবাদী, কোরআন অস্বীকারকারী ও কাফির। সাহাবায়ে কিরামের সর্বপ্রথম ইজমা এই মাস'আলার উপরই সংঘটিত হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতেই প্রথম খলীফা সিদ্দীকে আকবর (রা) ভণ্ড নবুয়তের দাবিদার মুসায়লামা প্রমুখের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করে তার সকল অনুসারীসহ তাকে হত্যা করেন।

এ সম্পর্কে প্রথম যুগের ইমাম ও খ্যাতনামা উলামায়ে কিরামের উক্তি এবং ব্যাখ্যাসমূহ 'খতমে নবুয়ত' নামক পুস্তিকার ৩য় খণ্ডে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে তার কয়েকটি কথা উদ্ধৃত করা হলো ঃ

প্রখ্যাত মুফাস্‌সির হযরত ইবনে কাসীর এ আয়াতের তফসীর প্রসংগে লিখেছেন ঃ

اخبر الله تعالى فى كتابه و رسول الله صلم فى السنة المتواترة عنه انه
لا نبى بعده ليعلموا ان كل من ادعى هذا المقام بعده فهو كذاب افاك
دجال ضال مضل ولو تحرق و شعبذ واتى بانواع السحر والطلاسم والنير
نجيات فكلها محال و ضلال عند اولى الالباب كما اجرى الله سبحانه على
يد الاسود العنسى باليمن و مسيلمة الكذاب باليمامة من الاحوال الفا-
سدة و الاقوال الباردة ما علم كل ذى لب و فهم و حجى انهما كاذبان
ضالان لعنهما الله تعالى وكذلك كل مدع لذلك الى يوم القيمة حتى
يختموا بالمسيح الدجال (ابن كثير)

অর্থাৎ "আল্লাহ্ পাক স্বীয় গ্রন্থ এবং রসূলুল্লাহ্ (সা)-র বহু হাদীসের মাধ্যমে এ তথ্য প্রকাশ করেছেন যে, তাঁর (সা) পর কোন নবী বা রসূল নেই। যেন মানুষ এ কথা অনুধাবন করে যে, তাঁর (সা) পরে যে ব্যক্তি নবুয়তের দাবি করবে সে মিথ্যাবাদী, ভণ্ড, দজ্জাল, পথভ্রষ্ট, বিভ্রান্তকারী---সে যত চালবাজির আশ্রয় নিক না কেন এবং নানা প্রকারের যাদু, ঐন্দ্রজালিক কলাকৌশল ও ভেল্কিবাজি প্রদর্শন করুক না কেন, এগুলো সবই প্রজ্ঞাবান ও বিদগ্ধ সমাজের নিকট অসম্ভব ও ভ্রষ্টতাপূর্ণ বলে প্রতীয়মান হবে। যেমন করে আল্লাহ্ পাক ইয়ামেন প্রদেশে আসওয়াদ উনাইসী (নবুয়তের) এবং ইয়ামামাহ্ প্রদেশে মুসায়লামা কাজ্জাবের মাধ্যমে এমন সব ভ্রান্তিকর ঘটনাবলী, অলীক ও অমূলক উক্তিসমূহের প্রকাশ ঘটিয়েছেন সেগুলো দেখে-শুনে প্রতিটি জ্ঞানী ও বিবেকবান ব্যক্তি বুঝে নিয়েছেন যে, এরা উভয়ই মিথ্যাবাদী ও পথভ্রষ্ট। এদের প্রতি আল্লাহ্‌র অভিশাপ নিপতিত হোক। অনুরূপভাবে কিয়ামত পর্যন্ত যে কোন ব্যক্তি নবুয়তের দাবি করবে সে মিথ্যাবাদী ও কাফির। বস্তুত মসীহে-দাজ্জাল পর্যন্ত গিয়ে নবুয়তের ভণ্ড দাবিদারদের এ ধারার পরিসমাপ্তি ঘটবে।"

ইমাম গাজ্জালী (র) তাঁর রচিত গ্রন্থ 'কিতাবুল ইকতিসাদ ফিল ইতিকাদে' ( كتاب الاقتصاد فى الاعتقاد ) উপরোল্লিখিত আয়াতের তফসীর ও খতমে-নবুয়তের আকীদা প্রসংগে লিখেছেন ঃ

وليس فيه تاويل ولا بتخصيص ومن اوله بتخصيص فكلامه من الهذيان لا يمنع الحكم بتكفيره لانه مكذب لهذا النص الذى اجمعت الامة على انه غير مأول ولا مخصوص

অর্থাৎ "এ আয়াতে অন্য কোন ব্যাখ্যা বা বিশেষীকরণের অবকাশ নেই এবং যে ব্যক্তি আয়াতের বিকল্প ব্যাখ্যা প্রদানের মাধ্যমে নবুয়ত পদ এখনো বিদ্যমান আছে বলে মত পোষণ করবে, তার এরূপ উক্তি সম্পূর্ণ অমূলক ও ভ্রান্তিপ্রসূত। এরূপ ব্যাখ্যা তাকে কাফিরদের দলভুক্ত হওয়া থেকে কোন অবস্থাতেই রেহাই দেবে না। কেননা সে এ আয়াতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে প্রয়াস পাচ্ছে। যে আয়াত বিকল্প ব্যাখ্যাযোগ্য নয় বলে গোটা উম্মত একমত"।

কাজী আয়ায 'শেফা' নামক গ্রন্থে নবীজী (সা)-র পরে নবুয়তের দাবিদারদেরকে কাফির মিথ্যাবাদী রসূলুল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা আরোপকারী ও উল্লিখিত আয়াতের সত্যতা অস্বীকারকারী বলে আখ্যাদান পূর্বক নিম্নরূপ মন্তব্য করেন ঃ

واجمعت الامة على حمل هذا الكلام على ظاهره وان مفهومه المراد به دون تاويل ولا تخصيص فلا شك فى كفر هؤلاء الطوائف كلها قطعا اجماعا وسمعا

অর্থাৎ "গোটা উম্মত এ ব্যাপারে একমত। এ ক্ষেত্রে উল্লিখিত আয়াতের বাহ্যিক অর্থই গ্রহণ করতে হবে। বাহ্যত যেরূপ বোঝা যাচ্ছে প্রকৃত প্রস্তাবে এ আয়াতের মর্মও তা-ই। অধিকন্তু আয়াতে বিকল্প ব্যাখ্যার অবকাশই নেই। বস্তুত নবুয়তের দাবিদারদের অনুসারী এসব উপদলের কুফরী সম্পর্কে কোন প্রকারের সন্দেহই থাকতে পারে না। বরং এদের কুফরী কোরআন হাদীস ও ইজমায়ে-উম্মত দ্বারা অকাট্যভাবে প্রমাণিত।"

খতমে-নবুয়ত পুস্তিকার ৩য় খণ্ডে শরীয়তের ইমাম এবং সকল শ্রেণীর বিশিষ্ট উলামায়ে কিরামের বিপুল সংখ্যক বাণী সঙ্কলিত হয়েছে। আর এখানে যা বর্ণনা করা হয়েছে একজন মুসলমানের পক্ষে তা-ই যথেষ্ট।

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴿٤١﴾ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً
وَأَصِيلًا ﴿٤٢﴾ هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ

الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ؕ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَحِيْمًا ﴿٤٣﴾ تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهٗ
سَلٰمٌ ۚ وَاَعَدَّ لَهُمْ اَجْرًا كَرِيْمًا ﴿٤٤﴾ يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّاۤ اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا
وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا ﴿٤٥﴾ وَّدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا ﴿٤٦﴾
وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ بِاَنَّ لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ فَضْلًا كَبِيْرًا ﴿٤٧﴾ وَلَا تُطِعِ
الْكٰفِرِيْنَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ وَدَعْ اَذٰىهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ﴿٤٨﴾

(৪১) মু'মিনগণ তোমরা আল্লাহ্‌কে অধিক পরিমাণে স্মরণ কর। (৪২) এবং সকাল-বিকাল আল্লাহ্‌র পবিত্রতা বর্ণনা কর। (৪৩) তিনিই তোমাদের প্রতি রহমত করেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণও রহমতের দোয়া করেন---অন্ধকার থেকে তোমাদেরকে আলোকে বের করার জন্য। তিনি মু'মিনদের প্রতি পরম দয়ালু। (৪৪) যেদিন আল্লাহ্‌র সাথে মিলিত হবে, সেদিন তাদের অভিবাদন হবে সালাম। তিনি তাদের জন্য সম্মানজনক পুরস্কার প্রস্তুত রেখেছেন। (৪৫) হে নবী! আমি আপনাকে সাক্ষী, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি। (৪৬) এবং আল্লাহ্‌র আদেশক্রমে তাঁর দিকে আহবায়করূপে এবং উজ্জ্বল প্রদীপরূপে। (৪৭) আপনি মু'মিনদেরকে সুসংবাদ দিন যে, তাদের জন্য আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে বিরাট অনুগ্রহ রয়েছে। (৪৮) আপনি কাফির ও মুনাফিকদের আনুগত্য করবেন না এবং তাদের উৎপীড়ন উপেক্ষা করুন ও আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করুন। আল্লাহ্ কার্যনির্বাহীরূপে যথেষ্ট।

### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

হে মু'মিনগণ! তোমরা [সাধারণভাবে মহান আল্লাহ্‌র অনুগ্রহরাজি এবং বিশেষভাবে এরূপ পুণ্যতম রসূল (সা)-এর প্রেরণজনিত অনুগ্রহের কথা স্মরণ করে এর শুকরিয়া আদায় করতে গিয়ে] আল্লাহ্ পাককে অধিক পরিমাণে স্মরণ কর (যাবতীয় ইবাদতই এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে) এবং (এ ইবাদত ও যিকিরে সর্বক্ষণ স্থায়ী থাক। সুতরাং) সকাল-সন্ধ্যায় (অর্থাৎ সর্বক্ষণ) তাঁর গুণ-কীর্তন করতে থাক (অর্থাৎ মনে মনে বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাহায্যে এবং মৌখিকভাবে। সুতরাং প্রথম বাক্যে যাবতীয় আমল ও ইবাদত এবং দ্বিতীয় বাক্যে সকল সময় ও কাল অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। অর্থাৎ কোন হুকুম পালন করবে আবার কোন হুকুম পালন করবে না এবং একদিন কোন কাজ করবে অপরদিন তা করবে না এমনটি যেন না হয়। আর যেহেতু তিনি তোমাদের প্রতি বহুবিধ অনুগ্রহ প্রদর্শন করেছেন এবং ভবিষ্যতেও করবেন, সুতরাং অবশ্যম্ভাবীরূপে তিনি সর্বাবস্থায় কৃতজ্ঞতা লাভের অধিকারী ও যিকিরের যোগ্য। বস্তুত) তিনি এমন (দয়াশীল) যে তিনি

(স্বয়ংও) এবং (তাঁর হুকুমে) তাঁর ফেরেশতাগণ (ও) তোমাদের প্রতি রহমত ও করুণা প্রেরণ করতে থাকেন। (তাঁর রহমত প্রেরণ করা অর্থ রহমত বর্ষণ করা এবং তাঁর ফেরেশতাগণ কর্তৃক প্রেরণ করা অর্থ রহমতের জন্য দোয়া করা। যেমন মহান আল্লাহ্‌র বাণী الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ — الى قوله — وَقِهِمُ السَّيِّاٰتِ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত। আর এরূপ রহমত প্রেরণ এজন্য) যেন আল্লাহ্ তা'আলা (এ রহমতের বদৌলতে) তোমাদিগকে (অজ্ঞানতা ও পথভ্রষ্টতার) আঁধার থেকে বিজ্ঞান ও হিদায়তের) জ্যোতিপানে নিয়ে আসেন (অর্থাৎ আল্লাহ্ পাকের অসীম অনুগ্রহ ও ফেরেশতাকুলের দোয়ার বদৌলতে তোমরা ইলম ও হিদায়তের তওফিক লাভ করেছ এবং এর উপর স্থির রয়েছ যা সর্বদা নতুন প্রাণ লাভ করে যাচ্ছে) এবং (এ দ্বারা প্রমাণিত হল যে,) আল্লাহ্ পাক মু'মিনদের প্রতি অত্যন্ত দয়াবান। (এবং মু'মিনদের অবস্থার প্রতি এ রহমত ইহকালেও রয়েছে এবং পরকালেও তাঁর করুণার বর্ষণ স্থলে পরিণত হবে)। বস্তুত যে দিন আল্লাহ্ পাকের সাথে তাঁদের সাক্ষাৎ ঘটবে সেদিন তাঁদের প্রতি যে সালাম প্রদত্ত হবে তা হবে। (আল্লাহ্ পাকের স্বয়ং ইরশাদকৃত) আসসালামু-আলায়কুম (প্রথমত এ সালামই সম্মান প্রদর্শনের লক্ষণ---বিশেষ করে যখন এ সালাম আল্লাহ্ পাকের পক্ষ থেকে প্রদত্ত হবে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন سَلَامٌ قَوْلًا مِّنْ رَّبٍّ رَّحِيمٍ ইবনে মাজাহ প্রমুখ হাদীসগ্রন্থসমূহে রয়েছে যে আল্লাহ্ পাক স্বয়ং জান্নাতবাসীদের প্রতি সম্বোধন করে ফরমান ঃ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ এ সালাম তো হলো আত্মিক পুরস্কার---যার সারমর্ম সম্মান প্রদর্শন করা) এবং (পরবর্তী পর্যায়ে বাহ্যিক ও দৈহিক পুরস্কারের সংবাদ সাধারণ শিরোনামায় প্রদত্ত হয়েছে যে) আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদের (মু'মিনগণের) জন্য (জান্নাতে) উত্তর প্রতিদান তৈরী করে রেখেছেন। (অপেক্ষা কেবল তাঁদের পৌঁছবার, পৌঁছামাত্র তাঁরা এসব পূর্ব প্রস্তুত পুরস্কার ও প্রতিদান লাভ করবেন। পরে হুযূর (সা)-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে) হে নবী! (সা) (আপনি গুটিকয়েক পরিহাসকারীদের কটাক্ষপাতে বিচলিত হবেন না। যদি এসব নির্বোধরা আপনাকে চিনতে সক্ষম না হয় তবে কি আসে যায়, মু'মিনদের জন্য বেহেশতে যে সব অনন্য ও অনির্বচনীয় অনুগ্রহ ধারা ও রহমতসমূহের কথা বিবৃত হয়েছে তা তো কেবল আপনার বক্তব্যই যথেষ্ট হবে। অন্য কোন প্রমাণাদির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা হবে না। সুতরাং এ দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে, তিনি আল্লাহ্ পাকের মত প্রিয় ও নৈকট্যপ্রাপ্ত। বস্তুত) আমি নিঃসন্দেহে আপনাকে এমন বিশেষ মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী রসূলরূপে প্রেরণ করেছি যে, আপনি (কিয়ামতের দিন উম্মতের পক্ষে স্বয়ং রাজসাক্ষী) হবেন [ফলত আপনার বক্তব্যানুসারে তাদের (উম্মতের) ফরসালা হবে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ اِنَّا اَرْسَلْنَا اِلَيْكُمْ رَسُوْلًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ

এবং স্বয়ং মামলা বিজড়িত ব্যক্তিকে অপর পক্ষের মুকাবিলায় সাক্ষী মানা যে কত উন্নত মান মর্যাদার পরিচায়ক তা বলার অপেক্ষা রাখে না----যার প্রকাশ ঘটবে কিয়ামতের দিন] এবং (দুনিয়াতে তাঁর যে সব নিখুঁত ও পূর্ণ গুণাবলীর প্রকাশ ঘটেছে তা এই যে) তিনি (মু'মিনদের জন্য) সুসংবাদ প্রদানকারী ও (কাফিরদের জন্যে) ভীতি প্রদর্শনকারী এবং (সাধারণভাবে সবাইকে) আল্লাহ্ পাকের দিকে তাঁর অনুমতি সাপেক্ষে আহ্বানকারী (এবং এই সুসংবাদ প্রদান, ভীতি প্রদর্শন ও আল্লাহ্র দিকে আহ্বান নিছক তবলীগ ও প্রচার উপলক্ষে) এবং (নিজ সত্তা, বৈশিষ্ট্য, গুণাবলীর উপাসনা-আরাধনা, আচার-ব্যবহার, স্বভাব-চরিত্র প্রভৃতি সমষ্টিগত অবস্থা বিচারে) তিনি (আপাদমস্তক হিদায়তের আদর্শ হিসেবে) এক প্রদীপ্ত বাতির তুল্য। অর্থাৎ তাঁর প্রতিটি অবস্থা আলোর অনুসন্ধানকারীদের জন্য হিদায়তের মূল উৎস বিশেষ। বস্তুত কিয়ামত দিবসে এই মু'মিনগণের প্রতি যে সব রহমত বর্ষিত হবে তা তাঁর সুসংবাদ প্রদানকারী ভীতি প্রদর্শনকারী, আহবানকারী ও প্রোজ্জ্বল দীপ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য গুণাবলীর কল্যাণেই। সতরাং আপনি এতদসংক্রান্ত উদ্বেগ দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনা পরিহার করুন) এবং নিজ পদোচিৎ দায়িত্ব ও কর্তব্যে মনোনিবেশ করুন। অর্থাৎ মু'মিনগণকে এ সুসংবাদ দিন যে, তাঁদের প্রতি আল্লাহ্ পাকের অসীম করুণা বর্ষিত হবে (অনুরূপভাবে কাফির ও কপট-বিশ্বাসীদেরকে ভীতি প্রদর্শন করতে থাকুন। যা এক বিশেষ শিরোনামায় প্রকাশ করে বলেছেন যে,) ঐ কাফির ও মুনাফিকদের কথা মানবেন না [নবীজী (সা)-র পক্ষে তো এরূপ সম্ভাবনাই ছিল না যে, তিনি কাফির ও মুনাফিকদের কথায় প্রভাবান্বিত হয়ে দাওয়াত ও তবলীগের কাজ পরিত্যাগ করবেন। কিন্তু লোকের পরিহাস ও কটাক্ষপাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার লক্ষ্যে হযরত যয়নব (রা)-এর বিয়ের মাধ্যমে যে বাস্তব ভিত্তি ও কার্যকর তবলীগ উদ্দেশ্য ছিল তাতে তাঁদের খানিকটা শৈথিল্য প্রদর্শনের সম্ভাবনা ছিল। এটাকেই কাফিরদের কথা মেনে নেওয়া বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।] এবং ওদের (এই কাফির ও মুনাফিকদের) পক্ষ থেকে যে যন্ত্রণা দেওয়া হবে (যেমনভাবে এ বিয়ে প্রসংগে মৌখিক যন্ত্রণা দেওয়া হয়েছিল আর তবলীগ ছিল বাস্তব আমল দ্বারা) সেগুলোর প্রতি ভ্রূক্ষেপও করবেন না (এবং কাজ কর্মের মাধ্যমে যন্ত্রণা পৌঁছানোর আশংকাও করবেন না। যদি এরূপ ধারণা মনে জাগে তবে) সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ্র উপর নির্ভর করুন। আর আল্লাহ্ পাকই কর্মকুশল ও অভিভাবকরূপে যথেষ্ট। (তিনি আপনাকে যাবতীয় দুঃখ-যন্ত্রণা থেকে রক্ষা করবেন। আর তবলীগ করতে গিয়ে যদি বাহ্যত কোন প্রকারের যন্ত্রণা পৌঁছে ---তা অভ্যন্তরীণভাবে মূলত কল্যাণ ও উপকারে পরিণত হয়---যা উকিল ও যথেষ্ট হওয়ার মর্মে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির পরিপন্থী নয়।

**আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়**

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন ও সম্মান প্রদর্শন এবং তাঁর প্রতি দুঃখ-যন্ত্রণা পৌঁছানো থেকে বিরত থাকার মর্মে প্রদত্ত উপদেশাবলী প্রসংগে আনুষঙ্গিকভাবে হযরত যায়েদ ও যয়নব (রা)-এর ঘটনা এবং রসূলুল্লাহ্ (সা)-র

সর্বশেষ নবী হওয়ার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। পরবর্তী পর্যায়েও তাঁর অনন্য ও অনুপম গুণাবলী বিবৃত হয়েছে। আর তাঁর সত্তা ও গুণাবলী গোটা বিশ্বে মুসলমানদের জন্য সর্বশেষ নিয়ামত বলে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উদ্দেশ্যে উল্লিখিত আয়াতে অধিক পরিমাণে আল্লাহ্ পাকের যিকিরের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

**আল্লাহ্র যিকির এমন এক ইবাদত যা সর্বাবস্থায় ফরয এবং অধিক পরিমাণে করার নির্দেশ রয়েছে ঃ** يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ---হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন যে, আল্লাহ্ পাক যিকির ব্যতীত এমন কোন ফরযই আরোপ করেন নাই যার পরিসীমা ও পরিমাণ নির্ধারিত নেই। নামায, দিনে পাঁচবার এবং প্রত্যেক নামাযের রাকাত নির্দিষ্ট, রমযানের রোযা নির্ধারিত কালের জন্য, হজ্জও বিশেষ স্থানে বিশেষ অনুষ্ঠানাদি ও সুনির্দিষ্ট কর্ম-ক্রিয়ার নাম। যাকাতও বছরে একবারই ফরয হয়। পক্ষান্তরে আল্লাহ্র যিকির এমন ইবাদত যার কোন সীমা বা সংখ্যা নির্ধারিত নেই। বিশেষ সময়কালও নির্ধারিত নেই অথবা এর জন্য দাঁড়ান বা বসার কোন বিশেষ অবস্থাও নির্ধারিত নেই। এমনকি পবিত্র এবং ওযূসহ থাকারও কোন শর্ত আরোপ করা হয় নি। প্রতি মুহূর্তে সকল অবস্থায় আল্লাহ্র যিকির অধিক পরিমাণে করার নির্দেশ রয়েছে সফরে থাকুক বা বাড়িতে অবস্থান করুক, সুস্থ থাকুক বা অসুস্থ, স্থলভাগ হোক বা জলভাগ, রাত হোক বা দিন—সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র যিকিরের হুকুম রয়েছে।

এজন্যই ইহা বর্জন করলে বর্জনকারীর কোন কৈফিয়তই গ্রহণযোগ্য হবে না, যদি না সে অনুভূতিহীন ও বেহুশ হয়ে পড়ে। পক্ষান্তরে অন্যান্য ইবাদতের বেলায় অসুস্থতা ও অপারগতার পরিপ্রেক্ষিতে মানুষকে অক্ষম বিবেচনা করে ইবাদতের পরিমাণ হ্রাস বা উহা একেবারে মাফ হয়ে যাওয়ার অবকাশও রয়েছে। কিন্তু যিকরুল্লাহ্ সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক কোন শর্ত আরোপ করেন নি। তাই উহা বর্জনের পরিপ্রেক্ষিতে কোন অবস্থাতেই কোন ওযর গ্রহণযোগ্য হবে না। অধিকন্তু এর ফযিলত-বরকতও অগণিত।

ইমাম আহমদ (রা) হযরত আবুদ দারদা (রা) হতে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবায়ে-কিরামকে সম্বোধন করে ফরমান যে, আমি কি তোমাদেরকে এমন বস্তুর সন্ধান দেব না, যা তোমাদের যাবতীয় আমলের চাইতে উত্তম, তোমাদের প্রভুর নিকটে সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য তোমাদের মর্যাদা বিশেষভাবে বর্ধনকারী, আল্লাহ্র রাস্তায় সোনা-রূপা দান করা এবং আল্লাহ্র পথে জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হয়ে শত্রুদের মুকাবিলা করতে গিয়ে তাদেরকে হত্যা করা বা নিজে শাহাদৎ বরণ করার চাইতে উত্তম? সাহাবায়ে কিরাম আরয করলেন ঃ ইয়া রসূলুল্লাহ্ সেটা কি বস্তু; কোন আমল? রসূলুল্লাহ্ ফরমান---ذكر الله عز و جل "মহীয়ান গরীয়ান আল্লাহ্ পাকের যিকির।' —(ইবনে-কাসীর) ইমাম আহমদ ও ইমাম তিরমিযী আরও রেওয়ায়েত করেন যে, হযরত আবূ হুরায়রা (রা) ফরমান ঃ আমি নবীজী (সা)-র নিকট থেকে এমন এক দোয়া শিক্ষালাভ করেছি, যা কখনো পরিত্যাগ করি না। তা এই

اللهم اجعلنى اعظم شكرك و اتبع نصيحتك و اكثر ذكرك و احفظ وصيتك (ابن كثير)

অর্থাৎ হে আল্লাহ্! আমাকে অধিক পরিমাণে তোমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের, তোমার উপদেশের অনুসারী হওয়ার, অধিক পরিমাণে তোমার যিকির করার এবং তোমার অছিয়ত সংরক্ষণের যোগ্য করে দাও।---( ইবনে-কাসীর )

এতে রসূলুল্লাহ্ (সা) আল্লাহ্ পাকের নিকট অধিক পরিমাণে তাঁর যিকিরের তওফিক প্রদানের জন্য দোয়া করেছেন।

জনৈক বেদুঈন রসূলুল্লাহ্ (সা)-র খিদমতে আরয করলো যে, ইসলামের আমল-সমূহ, ফরয ও ওয়াজিবসমূহ তো অসংখ্য। আপনি আমাকে এমন একটি সংক্ষিপ্ত অথচ সবকিছু অন্তর্ভুক্তকারী কথা বলে দিন, যা সুদৃঢ়ভাবে উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করে নিতে সক্ষম হই। রসূলুল্লাহ্ (সা) ফরমান ঃ

لايزال لسانك رطبا بذكر الله (مسند احمد، ابن كثير) অর্থাৎ "তোমার কণ্ঠ সর্বদা আল্লাহ্র যিকিরে সরব ও তরতাজা থাকা চাই।" মুসনদ আহমদ ও ইবনে-কাসীর। হযরত আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) ফরমান ঃ

اذكروا الله تعالى حتى يقولوا مجنون (مسند احمد، ابن كثير)

অর্থাৎ "তুমি আল্লাহ্র যিকির এত অধিক পরিমাণে কর যেন লোকে তোমাকে পাগল বলে আখ্যায়িত করে।" ( মুসনাদ-আহমদ, ইবনে-কাসীর )

হযরত আবদুল্লাহ্ বিন্ উমর (রা) থেকে আরো বর্ণিত আছে যে, নবীজী (সা) ফরমান---যে ব্যক্তি এমন কোন আসরে বসে যেখানে আল্লাহ্র যিকির নেই, তবে কিয়ামতের দিন এ আসর তার জন্য সন্তাপ ও অনুশোচনার কারণ হবে।---( আহমদ ইবনে-কাসীর )

وسبحوه بكرة و اصيلا অর্থাৎ সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহ্র পবিত্রতা বর্ণনা কর।

সকাল-সন্ধ্যার দ্বারা সকল সময়কেই বোঝানো হয়েছে। সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহ্র যিকিরে বিশেষ বরকত ও তাকীদ রয়েছে বলে আয়াতেও এ দু'সময়ের উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যথায় আল্লাহ্র যিকির কোন বিশেষ সময়ের জন্য সীমিত ও নির্দিষ্ট নয়।

هو الذى يصلى عليكم و ملئكته অর্থাৎ "যখন তুমি অধিক পরিমাণে আল্লাহ্র যিকিরে অভ্যস্ত হয়ে পড়বে এবং প্রত্যহ সকাল-সন্ধ্যায় যিকির করতে থাকবে, বিনিময়ে আল্লাহ্র নিকট এই প্রতিদান ও মর্যাদা লাভ করবে যে, আল্লাহ্ পাক তোমাদের

প্রতি অজস্র ধারায় রহমত ও অনুকম্পা বর্ষণ করতে থাকবেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণ তোমাদের জন্য দোয়া করতে থাকবেন।"

উল্লিখিত আয়াতে "صلوا" শব্দটি আল্লাহ্ পাকের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে এবং ফেরেশতাদের ক্ষেত্রেও। কিন্তু উভয় স্থলে উহার অর্থ এক নয়; বরং ভিন্ন ভিন্ন। আল্লাহ্র "صلوا" অর্থ তিনি রহমত নাযিল করেন। পক্ষান্তরে ফেরেশতাগণ তো নিজের তরফ থেকে কোন কাজ করতে সক্ষম নন। সুতরাং তাঁদের "صلوا" অর্থ এই যে, তাঁরা আল্লাহর দরবারে রহমত বর্ষণের জন্য দোয়া করবেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র পক্ষে صلوا অর্থ রহমত, ফেরেশতাদের পক্ষে মাগফেরাত কামনা করা এবং পরস্পর একে অপরের পক্ষে এর অর্থ দোয়া صلوا এ তিন অর্থেই ব্যবহৃত হয়। সুতরাং যারা عموم مشترک তথা সামগ্রিক অর্থে শব্দের ব্যবহার বৈধ মনে করেন তাঁদের মতে "صلوا" শব্দটি ব্যাপক অর্থবোধক। কিন্তু আরবী ব্যাকরণ বিধি অনুসারে عموم مشترک যাদের নিকট বৈধ নয় তাদের মতে عموم مجاز অর্থাৎ বিশেষ ব্যাপক অর্থবোধক হিসাবে আলোচ্য সকল অর্থেই ইহার ব্যবহার রীতিশুদ্ধ।

تحيتهم يوم يلقونه سلام ইহা এই صلوا এরই ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ—যা মু'মিনগণের প্রতি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে হয়ে থাকে অর্থাৎ যেদিন আল্লাহ্ পাকের সাথে এদের সাক্ষাৎ ঘটবে—তখন তাঁর পক্ষ থেকে এদেরকে সালাম অর্থাৎ আস্সালামু আলায়কুমের মাধ্যমে সাদর সম্ভাষণ জানানো হবে। ইমাম রাগেব প্রমুখের মতে আল্লাহ্ পাকের সংগে সাক্ষাতের দিন হলো কিয়ামতের দিন। আবার কোন কোন তফসীরকারের মতে এ সাক্ষাতের সময় হলো বেহেশতে প্রবেশকাল যেখানে তাদের প্রতি আল্লাহ্ ও ফেরেশতাগণের পক্ষ থেকে সালাম পৌঁছানো হবে। আবার কোন কোন মুফাস্সির মৃত্যু দিবসকে আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাতের দিন বলে মন্তব্য করেছেন। সেদিন সমগ্র বিশ্বের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করে আল্লাহ্র সমীপে উপস্থিত হওয়ার দিন। যেমন হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, মালাকুল-মউত যখন কোন মু'মিনের প্রাণ বিয়োগ ঘটাতে আসেন তখন তাঁর প্রতি এ সুসংবাদ পৌঁছানো হয় যে, আপনার পালনকর্তা আপনার জন্য সালাম প্রেরণ করেছেন। আর لقاء শব্দ এই তিন ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। তাই এসব উক্তির মাঝে কোন বিরোধ ও অসামঞ্জস্য নেই। বস্তুত এ তিন অবস্থাতেই আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সালাম পৌঁছানো হবে।---(রূহুল-মা'আনী)

**মাস'আলা ঃ** এ আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হলো যে, মুসলমানদের পারস্পরিক অভিবাদন ও সম্ভাষণ আস্‌সালামু আলায়কুম হওয়া উচিত, চাই বড়দের পক্ষ থেকে ছোটদের প্রতি হোক অথবা ছোটদের পক্ষ থেকে বড়দের প্রতি হোক।

**রসূলুল্লাহ (সা)-র বিশেষ গুণাবলী ঃ** يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا এটা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র বিশেষ গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যসমূহের পুনরুল্লেখ। এখানে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র পাঁচটি গুণ বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ داعى نذير، مبشر، شاهد الى الله—سراج منير অর্থ ঃ তিনি কিয়ামতের দিন উম্মতের জন্য সাক্ষ্য প্রদান করবেন। যেমন সহীহ্ বুখারী, মুসলিম, নাসায়ী, তিরমিযী প্রভৃতি হাদীসগ্রন্থে হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে এক সুদীর্ঘ হাদীস বর্ণিত আছে, যার কিয়দাংশ হলো এই ঃ কিয়ামতের দিন হযরত নূহ (আ) উপস্থিত হলে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হবে যে, আপনি আমার বাণী ও বার্তাসমূহ আপনার উম্মতের নিকটে পৌঁছিয়েছিলেন কি? তিনি আরয করবেন যে, আমি যথারীতি পৌঁছিয়ে দিয়েছি। অতপর তাঁর উম্মতগণ একথা অস্বীকার করবে যে, তিনি ওদের নিকট আল্লাহ্‌র বার্তা পৌঁছিয়েছেন। অতপর হযরত নূহ (আ)-কে জিজ্ঞেস করা হবে যে, আপনার এ দাবির স্বপক্ষে কোন সাক্ষী আছে কি? তিনি আরয করবেন যে, মুহাম্মদ (সা) এবং তাঁর উম্মত এর সাক্ষী। কোন কোন রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, তিনি সাক্ষী হিসেবে উম্মতে মুহাম্মদীকে পেশ করবেন এবং এ উম্মত তাঁর পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করবে। তখন হযরত নূহ (আ)-র উম্মত এই বলে জেরা করবে যে, তারা আমাদের ব্যাপারে কিভাবে সাক্ষ্য দিতে পারে---সে সময়ে, এদের তো জন্মই হয়নি। আমাদের সুদীর্ঘকাল পর এদের জন্ম। উম্মতে মুহাম্মদীর নিকটে এ জেরার উত্তর চাইলে পর তারা বলবে যে, সে সময়ে আমরা অবশ্য উপস্থিত ছিলাম না। কিন্তু আমরা এ সংবাদ আমাদের রসূলুল্লাহ্ (সা)-র নিকটে শুনেছি, যাঁর উপর আমাদের পূর্ণ ঈমান ও অটুট বিশ্বাস রয়েছে। এ সময় রসূলুল্লাহ্ (সা)-র নিকট থেকে তাঁর উম্মতের এ কথার সত্যতা যাচাইয়ের জন্য তাঁর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে।

সারকথা, রসূলুল্লাহ্ (সা) নিজ সাক্ষ্যের মাধ্যমে স্বীয় উম্মতের কথা এই বলে সমর্থন করবেন যে, নিঃসন্দেহে আমি তাদেরকে এ সংবাদ দিয়েছিলাম।

উম্মতের স্বপক্ষে সাক্ষ্য প্রদানের সাধারণ মর্ম এও হতে পারে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) স্বীয় উম্মতের প্রত্যেক ব্যক্তির ভাল-মন্দ আমলের সাক্ষ্য প্রদান করবেন এবং এ সাক্ষ্য এ ভিত্তিতে হবে যে, উম্মতের যাবতীয় আমল প্রত্যেক সকাল-সন্ধ্যায়---অপর রেওয়ায়েতে সপ্তাহে একদিন রসূলুল্লাহ্ (সা)-র খিদমতে পেশ করা হয়, আর তিনি উম্মতের প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার আমলের মাধ্যমে চিনতে পান। এজন্য কিয়ামতের দিন তাঁকে উম্মতের

সাক্ষী স্থির করা হবে ( সাঈদ বিন মুসাইয়্যেব থেকে ইবনুল মোবারক রেওয়ায়েত করেছেন---মাযহারী )।

আর " مبشر " অর্থ সুসংবাদ প্রদানকারী, যার মর্মার্থ এই যে, তিনি স্বীয় উম্মতের মধ্য থেকে সৎ ও শরীয়তানুসারী ব্যক্তিবর্গকে বেহেশতের সুসংবাদ দেবেন এবং " نذير " অর্থ ভীতি প্রদর্শনকারী অর্থাৎ তিনি অবাধ্য ও নীতিচ্যুত ব্যক্তিবর্গকে আযাব ও শাস্তির ভয়ও প্রদর্শন করবেন।

داعی الی الله -এর অর্থ তিনি উম্মতকে আল্লাহ্ পাকের সত্তা ও অস্তিত্ব এবং তাঁর আনুগত্যের প্রতি আহবান করবেন। بِاِذْنِهٖ-কে دَاعِيًا اِلَى اللهِ এর সংগে সম্পর্কযুক্ত করায় একথাই বোঝা যায় যে, তিনি মানবমণ্ডলীকে আল্লাহ্ পাকের দিকে তাঁর অনুমতি সাপেক্ষেই আহবান করবেন। এ শর্তের সংযোজন এ ইংগিতই প্রদান করে যে, তবলীগ ও দাওয়াতের কাজ অত্যন্ত কঠিন ও দুঃসাধ্য---যা আল্লাহ্‌র অনুমতি ও সাহায্য ব্যতীত মানুষের সাধ্যের বাইরে। سراج অর্থ প্রদীপ منير জ্যোতিষ্মান---রসূলুল্লাহ্ (সা)-র পঞ্চম গুণ ও বৈশিষ্ট্য এই বলা হয়েছে যে, তিনি জ্যোতিষ্মান প্রদীপ বিশেষ। আবার কতক মনীষী سراج منير এর মর্মার্থ কোরআনে পাক বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু কোরআনে পাকের বর্ণনাধারা ও প্রকাশভংগী দ্বারা একথাই বোঝা যায় যে, ইহাও হযরত (সা)-এরই বৈশিষ্ট্য ও গুণ বিশেষ।

সমসাময়িক কালের বায়হাকী বলে খ্যাত প্রখ্যাত মুফাস্‌সির কাযী সানাউল্লাহ্ (র) তফসীরে-মাযহারীতে ফরমান যে, তিনি (সা) তো প্রকাশ্যভাবে ভাষার দিক দিয়ে داعی الی الله আল্লাহ্‌র দিকে আহবানকারী) এবং অভ্যন্তরীণভাবে হৃদয়ের দিক দিয়ে তিনি প্রদীপ্ত ও জ্যোতিষ্মান বাতি বিশেষ---অর্থাৎ যেমনিভাবে গোটা বিশ্ব সূর্য থেকে আলো সংগ্রহ করে, তেমনিভাবে সমগ্র মু'মিনের হৃদয় তাঁর অন্তর রশ্মি দ্বারা উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে। এজন্যই সাহাবায়ে-কিরাম যারা ইহজগতে নবীজী (সা)-র সান্নিধ্য লাভে ধন্য হয়েছেন, তাঁরা গোটা উম্মতের মাঝে সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ বলে পরিগণিত। কেননা তাঁদের অন্তর নবীজীর অন্তর থেকে কোন মাধ্যম ব্যতীতই সরাসরি নূর ও ফয়েজ লাভ করার সুযোগ পেয়েছে। অবশিষ্ট উম্মত এ নূর সাহাবায়ে-কিরামের মাধ্যমে পরবর্তী পর্যায়ে মাধ্যমের বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে লাভ করেছেন এবং একথাও বলা যায় যে, সমগ্র আম্বিয়ায়ে কিরাম বিশেষ করে রসূলে করীম (সা) এ ধরাধাম থেকে অন্তর্ধানের পরও নিজ নিজ কবরে জীবিত আছেন। তাঁদের কবরের জীবন সাধারণ লোকের কবরের জীবন থেকে বহু গুণে শ্রেষ্ঠ ও উন্নত, যার অন্তর্নিহিত তত্ত্ব ও মাহাত্ম্য আল্লাহ্ পাকই ভাল জানেন।

যাহোক, উল্লিখিত জীবনের বদৌলতে কিয়ামত পর্যন্ত মু'মিনগণের অন্তঃকরণ তাঁর পূত-পবিত্র অন্তর থেকে জ্যোতি লাভ করতে থাকবে। আর যে ব্যক্তি তাঁর মর্যাদা ও সম্মান রক্ষার প্রতি যত বেশি যত্নবান থাকবেন এবং যত বেশি বেশি দরূদ পাঠ করবেন, তিনি এ নূরের অংশ তত বেশি পরিমাণে লাভ করবেন। রসূলুল্লাহ্ (সা)-র জ্যোতিকে বাতির সাথে তুলনা করা হয়েছে। অথচ তাঁর আধ্যাত্মিক ও আত্মিক আলো সূর্যের আলোর চাইতে ঢের বেশি। সূর্যকিরণে কেবল পৃথিবীর বাহ্যিক ও উপরিভাগই আলোকিত হয়। কিন্তু তাঁর (স) আত্মার জ্যোতিতে গোটা বিশ্বের অভ্যন্তরভাগ এবং মু'মিনদের অন্তর আলোকিত হয়। এই উপমার কারণ এই বলে মনে হয় যে, বাতির আলো থেকে নিজ ইচ্ছানুযায়ী উপকৃত হওয়া যায়। সর্বক্ষণ সে উপকার লাভ করা যায় ও বাতি পর্যন্ত পৌঁছনো সহজতর এবং তা অনায়াসেই লাভ করা যায়। পক্ষান্তরে সূর্য পর্যন্ত পৌঁছা একেবারে দুঃসাধ্য এবং সব সময় এর থেকে উপকার লাভ করা যায় না।

কোরআনে বর্ণিত রসূলুল্লাহ্ (সা)-র এই গুণাবলী কোরআনের ন্যায় তওরাতেও উল্লেখ রয়েছে। যেমন ইমাম বুখারী (র) নকল করেছেন যে, হযরত আতা বিন ইয়াসার (রা) ইরশাদ করেন যে, আমি একদিন হযরত আবদুল্লাহ্ বিন আমর ইবনুল আসের (রা) সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁকে অনুরোধ করলাম যে, তওরাতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র যেসব গুণের উল্লেখ রয়েছে, মেহেরবানীপূর্বক আমাকে সেগুলো বলে দিন। তিনি ইরশাদ করলেন, আমি তা অবশ্যই বলবো। আল্লাহ্র শপথ। রসূলুল্লাহ্ (সা)-র যেসব গুণের বর্ণনা কোরআনে রয়েছে, তা তওরাতেও রয়েছে। অতঃপর বললেন ঃ

انا ارسلناك شاهدا و مبشرا و نذيرا و حرزا للاميين انت عبدى و رسولى سميتك المتوكل ليس بفظ و لا غليظ و لا سخاب فى الاسواق و لا يدفع السيئة بالسيئة و لكن يعفو و يغفر لن يقبضه الله تعالى حتى يقيم به الملة العوجاء بان يقولوا لا اله الا الله و يفتح به اعينا عميا و اذانا صما و قلوبا غلفا

অর্থাৎ হে নবী (সা)। নিশ্চয়ই আমি আপনাকে সাক্ষীরূপে, সুসংবাদ প্রদানকারী, ভীতি প্রদর্শনকারী এবং উম্মীদের (নিরক্ষরদের) আশ্রয়স্থল ও রক্ষাস্থলরূপে প্রেরণ করেছি। আপনি আমার বান্দা ও রসূল। আমি আপনার নাম متوكل (আল্লাহ্র উপর ভরসাকারী) রেখেছি। আপনি কঠোর ও রুক্ষ স্বভাববিশিষ্ট নন। বাজারে হৈ-হুল্লোড়কারীও নন। আর না আপনি অন্যায় দ্বারা অন্যায়ের প্রতিদানকারী। বরং আপনি ক্ষমা করে দেন। পথভ্রষ্ট ও বক্র উম্মতকে সঠিক পথে দাঁড় না করিয়ে এবং তারা লাইলাহা ইল্লাল্লাহ্ না বলা পর্যন্ত আল্লাহ্ পাক আপনাকে দুনিয়া থেকে উঠিয়ে নেবেন না। আপনার মাধ্যমে মহান আল্লাহ্ অন্ধচোখ, বধির কান ও রুদ্ধ হৃদয়সমূহ খুলে দেবেন।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ
قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ۖ
فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾

**(৪৯) মু'মিনগণ, তোমরা যখন মু'মিন নারীদেরকে বিবাহ কর, অতপর তাদেরকে স্পর্শ করার পূর্বে তালাক দিয়ে দাও, তখন তাদেরকে ইদ্দত পালনে বাধ্য করার অধিকার তোমাদের নেই। অতপর তোমরা তাদেরকে কিছু দেবে এবং উত্তম পন্থায় বিদায় দেবে।**

**তফসীরের সার-সংক্ষেপ**

হে মু'মিনগণ! (তোমাদের বিয়ে সংশ্লিষ্ট হুকুমসমূহের মধ্যে এটাও এক হুকুম যে) যখন তোমরা মুসলিম মহিলাগণের সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হবে (এবং কোন কারণে যদি) তাদেরকে স্পর্শ করার পূর্বেই তালাক দিয়ে দাও তবে তাদের উপর ইদ্দত পালন (ওয়াজিব) নয়---যা তোমরা গণনা করতে থাকবে (যেন তাদেরকে ইদ্দতকালে দ্বিতীয় বিয়ে থেকে বারণ করতে পার। যেমন করে ইদ্দত পালন ওয়াজিব থাকা অবস্থায় দ্বিতীয় বিয়ে বারণ করা শরীয়ত মতেই জায়েয; বরং ওয়াজিব। যে ক্ষেত্রে ইদ্দত নেই) তখন তাদেরকে কিছু দ্রব্য-সামগ্রী বা টাকা-পয়সা দিয়ে দাও এবং পূর্ণ সৌজন্য ও শালীনতার মাধ্যমে তাদেরকে বিদায় কর। মুসলিম মহিলাদের ন্যায় আসমানী গ্রন্থে বিশ্বাসী মহিলাদেরও একই হুকুম। এখানে مؤمنات--এর উল্লেখ শর্ত হিসেবে নয়; বরং এটা একটা প্রেরণাদায়ক উপদেশ ---এই মর্মে যে, মু'মিনগণের পক্ষে বিয়ের ক্ষেত্রে মুসলিম মহিলা নির্বাচন করাই উত্তম।

হাতে স্পর্শ করা দ্বারা ইংগিতে স্ত্রীসহবাসকে বোঝানো হয়েছে। সে সহবাস চাই যথার্থভাবেই হোক বা শরীয়ত সহবাস বোঝায় এমন কোন অবস্থার পরই ( صحبت حكمى ) হোক। যথা তৃতীয় কারোর অবর্তমানে কেবল স্বামী-স্ত্রীর একান্তে নির্জনবাস হয়ে গেলে উহাও শরীয়ত অনুমোদিত সহবাসেরই অন্তর্গত। বস্তুত সহবাস প্রকৃতভাবেই হোক বা সেরূপ পরিবেশে স্বামী-স্ত্রীতে অবস্থানই হোক উভয় অবস্থাতেই ইদ্দত পালন ওয়াজিব (হিদায়া প্রভৃতি ফিকাহ্ গ্রন্থে এরূপ রয়েছে)। স্পর্শিত হওয়ার পূর্বেই তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর মোহরানা যদি নির্ধারিত হয়ে থাকে তবে অর্ধেক মোহরানা আদায় করলেই আয়াতে কথিত স্ত্রীকে দেয় মাতা, ( متاع ) আদায় হয়ে যাবে এবং سراح جميل ---সৌজন্যমূলক আচরণ অর্থ অনর্থক বাধা আরোপ করে না রাখা

এবং যে মাতা, ( متاع ) প্রদান ওয়াজিব তা পরিশোধ করে দেয়া আর প্রদত্ত মাতা ( متاع ) ফেরত না লওয়া, মৌখিকভাবেও কোন কটুবাক্য প্রয়োগ না করা।

**আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়**

পূর্ববর্তী আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র গুটি কয়েক অনন্য গুণাবলী এবং তাঁর বিশিষ্ট মর্যাদার বর্ণনা ছিল। সামনেও তাঁর সেসব বৈশিষ্ট্যাবলীর বর্ণনা রয়েছে, যা বিয়ে ও তালাক সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির ক্ষেত্রে তাঁর সাথে বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত ; সাধারণ উম্মতের তুলনায় এক্ষেত্রে তিনি স্বতন্ত্র মর্যাদার অধিকারী। ইতিপূর্বে ভূমিকা হিসেবে তালাক সম্পর্কে একটি সাধারণ হুকুম বর্ণনা করা হয়েছে, যা সমস্ত মুসলমানদের বেলায় প্রযোজ্য।

উল্লিখিত আয়াতে এ সম্পর্কে তিনটি হুকুম বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

**প্রথম হুকুম ঃ** কোন মহিলার সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হওয়ার পর যথার্থ নির্জনবাস ( خلوت صحيحه ) সংঘটিত হওয়ার পূর্বেই যদি কোন কারণে তাকে তালাক দেওয়া হয় ; তবে তালাক প্রদত্তা মহিলার উপর ইদ্দত পালন ওয়াজিব নয়। সে সংগে সংগেই দ্বিতীয় বিয়ে করতে পারে। উল্লিখিত আয়াতে হাতে স্পর্শ করার অর্থ ( স্ত্রী) সহবাস। সহবাস হাকীকী কিংবা হুকমী হতে পারে এবং উভয়ের একই হুকুম যা তফসীরের সার-সংক্ষেপ অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। শরীয়ত অনুমোদিত সহবাস ( صحبت حكمى ) যথার্থ নির্জন বাস ( خلوت صحيحه ) এর মাধ্যমে সংঘটিত হয়ে যায়।

**দ্বিতীয় হুকুম ঃ** তালাক প্রদত্তা স্ত্রীকে সৌজন্যমূলকভাবে শিষ্টাচারের মাধ্যমে কিছু উপঢৌকন প্রদান করে বিদায় করা উচিত। তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে কিছু উপঢৌকন প্রদানপূর্বক বিদায় করা মুস্তাহাব এবং কোন কোন অবস্থায় ওয়াজিব। যার বিস্তারিত বিবরণ তফসীরের সার-সংক্ষেপ অধ্যায়ে প্রদত্ত হয়েছে এবং সূরায়ে বাক্বারার আয়াত لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ সংশ্লিষ্ট বর্ণনা প্রসঙ্গে চলে গেছে। আর কোরআনের বাক্যে 'মাতা' ( متاع ) শব্দ গ্রহণ সম্ভবত এ হিকমত ও তাৎপর্যের পরিপ্রেক্ষিতে হয়েছে যে, 'মাতা' ( متاع ) শব্দটি অর্থগতভাবে অত্যন্ত ব্যাপক। মানবের জন্য উপকারী ও লাভজনক যে কোন বস্তু এর অন্তর্গত। নারীর অবশ্য প্রাপ্য ( حقوق واجبه ) মোহরানা প্রভৃতিও এর অন্তর্ভুক্ত। যদি অদ্যাবধি মোহরানা পরিশোধ না করে থাকে তবে তালাকের সময় সানন্দচিত্তে পরিশোধ করে দেবে এবং ওয়াজিব বহির্ভূত প্রাপ্য যথা—তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে বিদায়কালে এক জোড়া কাপড় প্রদানের যে বিধান রয়েছে তাও এর অন্তর্ভুক্ত। প্রত্যেক তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে যা দেওয়া মুসতাহাব। ( মাবসূত, মুহীত, রাহ্ ) এ প্রেক্ষিতে متعوهن নির্দেশবাচক ক্রিয়া

( صيغة امر ) সাধারণ প্রেরণা দানের জন্য ওয়াজিব ও ওয়াজিব-বহির্ভূত উভয় শ্রেণীই এর অন্তর্গত।---( রূহ্ )

প্রথিতযশা মুহাদ্দিস হযরত আবদ্ বিন হোমায়েদ হযরত হাসান (রা) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, প্রত্যেক তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে 'মাতা' ( متاع ) প্রদান করা ( মুস্তাহাব। চাই তার সাথে যথার্থ নির্জন বাস ) خلوت صحيحه হয়ে থাক বা না থাক; তার মোহরানা নির্ধারিত থাকুক বা না থাকুক।

**তালাকের সময় দেয় পোশাকের বিবরণ ঃ** বাদায়ে ( بدائع ) গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, তালাকের পর দেয় মুত্য়া ( متعه ) অর্থ ঐ পোশাক যা স্ত্রীলোকগণ বাড়ি থেকে বের হওয়ারকালে পরিধান করে---পায়জামা, জামা, ওড়না এবং আপাদমস্তক সমগ্র শরীর আবৃত করে ফেলে এমন একটি বড় চাদর এর অন্তর্ভুক্ত ( আমাদের বাংলাদেশের ক্ষেত্রে সম্ভবত এদেশে সাধারণভাবে পরিধেয় পোশাক---শাড়ী, জামা, বোরকা অথবা আপাদমস্তক আবৃত করে এমন একটি বড় চাদর অন্তর্ভুক্ত হবে---অনুবাদক। ) যেহেতু পোশাক---উত্তম, মধ্যম ও নিম্ন সব শ্রেণীরই হয়, সুতরাং ফিকাহ শাস্ত্রবিদগণ এ সম্পর্কে এ মত ব্যক্ত করেছেন যে, স্বামী স্ত্রী উভয়ই যদি ধনাঢ্য পরিবারভুক্ত হয় তবে উত্তম শ্রেণীর পোশাক দিতে হবে। আর যদি উভয়ই দরিদ্র পরিবারের হয় তবে নিম্ন মানের---আর যদি একজন ধনী ও অপরজন গরীব হয় তবে মধ্যম মানের পোশাক দিতে হবে ( নাফাকাত--- نفقات অধ্যায়ে মনীষী খাসসাফের ( خصاف ) উক্তি )।

**ইসলামে সদাচারের নযীরবিহীন শিক্ষা ঃ** গোটা বিশ্বে প্রাপ্য ও অধিকার আদায়ের নীতি কেবল বন্ধু-বান্ধব ও আপনজনের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। বড় জোর সাধারণ লোক পর্যন্ত সীমিত। সচ্চরিত্র ও সদাচার প্রদর্শন ও প্রয়োগের সীমা কেবল এটুকুই নয়। বিপক্ষীয় ব্যক্তিবর্গ ও শত্রুদের হক ও অধিকার আদায়ের তাকীদ বিধান কেবল ইসলামেই রয়েছে। বর্তমানকালে মানব অধিকার সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে বহুবিধ প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছে এবং এর জন্য কিছু বিধি-বিধান ও নীতিমালাও প্রণীত হয়েছে। এতদুদ্দেশ্যে বিশ্বের জাতিসমূহ থেকে পুঁজি বাবত কোটি কোটি টাকাও সংগৃহীত হচ্ছে। কিন্তু প্রথমত, এই প্রতিষ্ঠানগুলো ( বৃহৎ পরাশক্তিসমূহের ) রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ও স্বার্থসিদ্ধির খপ্পরে পড়ে আছে। দুর্গত মানুষের যতটুকু সাহায্য করা হয় তাও উদ্দেশ্য বিমুক্ত বা নিঃস্বার্থভাবে নয়। আবার সব জায়গায় বা সকল দেশও নয়; বরং যথায় স্বীয় উদ্দেশ্য ও স্বার্থসিদ্ধি হয়। যদি মেনে নেওয়া হয় যে, এসব প্রতিষ্ঠান যথারীতিই মানব সেবার দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে; তবুও এসব সাহায্য কোন এলাকায় কেবল তখনই পৌঁছে যখন সে এলাকা কোন সর্বগ্রাসী দুর্যোগ, মহামারী, ব্যাপক রোগব্যাধি ইত্যাদিতে আক্রান্ত হয়। ব্যক্তি মানুষের বিপদাপদ দুঃখ-যন্ত্রণার কে খবর রাখে? ব্যক্তিগত সাহায্যের জন্য কে এগিয়ে আসে? ইসলামের প্রজ্ঞাময় ও দূরদর্শিতাপূর্ণ শিক্ষা দেখুন। তালাকের বিষয়টা একেবারে সুস্পষ্ট যে, নিছক পারস্পরিক বিরোধ, ক্রোধ ও অসন্তুষ্টি থেকেই এর

উৎপত্তি। সাধারণত যার ফলশ্রুতি এই হয়ে থাকে যে, যে সম্পর্ক একাত্মতা, প্রেম-প্রীতি ও ভালবাসার ভিত্তিতে গড়ে উঠেছিল তা সম্পূর্ণ বিপরীত রূপ ধারণ করে পারস্পরিক ঘৃণা, বিদ্বেষ, শত্রুতা ও প্রতিশোধ গ্রহণ প্রবণতায় পরিণত হয়। কোরআনে করীমের উল্লিখিত আয়াত এবং অনুরূপ বহু সংখ্যক আয়াতের মাধ্যমে ঠিক তালাকের ক্ষেত্রে মুসলমানদের প্রতি যেসব নির্দেশাবলী প্রদান করা হয়েছে, তাতে সচ্চরিত্র ও সদাচরণের পুরোপুরি পরীক্ষা হয়ে যায়। মানব প্রবৃত্তি স্বভাবতই এটা চায় যে, যে নারী নানাবিধ দুঃখ-যাতনা ও জ্বালা-যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ করে তোলে পরিশেষে পুরোপুরি সম্পর্ক ছিন্ন করতে পর্যন্ত বাধ্য করেছে, তাকে চরম লাঞ্ছনা ও অবমাননাকর পরিবেশেই বের করে দেওয়া হোক এবং তা থেকে যতটুকু প্রতিশোধ গ্রহণ সম্ভব গ্রহণ করা হোক।

কিন্তু কোরআনে করীম তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীগণের প্রতি সাধারণভাবে ইদ্দত পালনের এক কঠিন ও অবশ্য পালনীয় বাধ্যবাধকতা আরোপ করেছে এবং স্বামী গৃহেই ইদ্দত পালনের শর্ত লাগিয়ে দিয়েছে। এ সময়ে স্ত্রীকে বাড়ি থেকে বের না করে দেওয়া তালাক দানকারীর প্রতি ফরয করে দেওয়া হয়েছে এবং তার প্রতিও তাকীদ রয়েছে যেন সে এ সময়ে বাড়ি থেকে বের না হয়ে যায়। দ্বিতীয়ত ইদ্দতকালীন সময়ে স্ত্রীর যাবতীয় খরচপত্র বহন স্বামীর উপর ফরয করে দেওয়া হয়েছে। তৃতীয়ত স্বামীর প্রতি বিশেষ তাকীদ রয়েছে যেন ইদ্দত পালনান্তে স্ত্রীকে যথারীতি পোশাক প্রদান পূর্বক সৌজন্যপূর্ণ-ভাবে স-সম্মানে বিদায় করে। যে সব নারীর সাথে কেবল বিয়ে বাক্য পাঠ করা হয়েছে, স্বামী গৃহে আগমন, সহবাস বা নির্জনবাসের সুযোগ হয়নি তাদেরকে ইদ্দত পালন পর্ব থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে। কিন্তু অন্যান্য স্ত্রীর তুলনায় তাকে পোশাক প্রদানের জন্য স্বামীর প্রতি অধিক তাকীদ রয়েছে। এরই সাথে তৃতীয় হুকুম এই যে ঃ سَرِّحُوْهُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا অর্থাৎ অত্যন্ত সৌজন্যপূর্ণ পরিবেশে তাদেরকে বিদায় কর---যাতে এরূপ বাধ্যতা আরোপ করা হয়েছে যেন---মৌখিকভাবে কোন কটুবাক্য প্রয়োগ না করে কোন প্রকারের কটাক্ষপাত বা নিন্দাবাদ না করে।

বিরোধ ও মনোমালিন্যের সময় প্রতিপক্ষের অধিকার কেবল সেই রক্ষা করতে পারে, যার স্বীয় ভাবাবেগের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ও আধিপত্য রয়েছে। ইসলামে যাবতীয় শিক্ষায় এর প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়েছে।

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّآ اَحْلَلْنَا لَكَ اَزْوَاجَكَ الّٰتِيْٓ اٰتَيْتَ اُجُوْرَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ
يَمِيْنُكَ مِمَّآ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلَيْكَ وَبَنٰتِ عَمِّكَ وَبَنٰتِ عَمّٰتِكَ وَبَنٰتِ خَالِكَ

وَبَنٰتِ خٰلٰتِكَ الّٰتِيْ هَاجَرْنَ مَعَكَ ۖ وَامْرَاَةً مُّؤْمِنَةً اِنْ وَّهَبَتْ نَفْسَهَا
لِلنَّبِيِّ اِنْ اَرَادَ النَّبِيُّ اَنْ يَّسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ؕ
قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِيْٓ اَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا
يَكُوْنَ عَلَيْكَ حَرَجٌ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝ تُرْجِيْ مَنْ تَشَآءُ مِنْهُنَّ
وَتُـْٔوِيْٓ اِلَيْكَ مَنْ تَشَآءُ ؕ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ؕ
ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَنْ تَقَرَّ اَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَآ اٰتَيْتَهُنَّ
كُلُّهُنَّ ؕ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا فِيْ قُلُوْبِكُمْ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَلِيْمًا ۝ لَا يَحِلُّ
لَكَ النِّسَآءُ مِنْۢ بَعْدُ وَلَآ اَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ اَزْوَاجٍ وَّلَوْ اَعْجَبَكَ
حُسْنُهُنَّ اِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِيْنُكَ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيْبًا ۝ ع

(৫০) হে নবী! আপনার জন্য আপনার স্ত্রীগণকে হালাল করেছি, যাদেরকে আপনি মোহরানা প্রদান করেন। আর দাসীদেরকে হালাল করেছি, যাদেরকে আল্লাহ্ আপনার করায়ত্ত করে দেন এবং বিবাহের জন্য বৈধ করেছি আপনার চাচাতো ভগ্নি, ফুফাতো ভগ্নি, মামাতো ভগ্নি ও খালাতো ভগ্নিকে, যারা আপনার সাথে হিজরত করেছে। কোন মু'মিন নারী যদি নিজেকে নবীর কাছে সমর্পণ করে, নবী তাকে বিবাহ করতে চাইলে সে-ও হালাল। এটা বিশেষ করে আপনারই জন্য—অন্য মু'মিনদের জন্য নয়। আপনার অসুবিধা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে। মু'মিনগণের স্ত্রী ও দাসীদের ব্যাপারে যা নির্ধারিত করেছি, আমার জানা আছে। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, দয়ালু। (৫১) আপনি তাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা দূরে রাখতে পারেন এবং যাকে ইচ্ছা কাছে রাখতে পারেন। আপনি যাকে দূরে রেখেছেন, তাকে কামনা করলে তাতে আপনার কোন দোষ নেই। এতে অধিক সম্ভাবনা আছে যে, তাদের চক্ষু শীতল থাকবে; তারা দুঃখ পাবে না এবং আপনি যা দেন, তাতে তারা সকলেই সন্তুষ্ট থাকবে। তোমাদের অন্তরে যা আছে, আল্লাহ্ জানেন। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, সহনশীল। (৫২) এরপর আপনার জন্য কোন নারী হালাল নয় এবং তাদের পরিবর্তে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করাও হালাল নয় যদিও তাদের

রূপলাবণ্য আপনাকে মুগ্ধ করে, তবে দাসীর ব্যাপার ভিন্ন। আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ের উপর সজাগ নজর রাখেন।

---

**তফসীরের সার-সংক্ষেপ**

হে নবী (সা)! (কিছু সংখ্যক হুকুম কেবল আপনার জন্যই নির্দিষ্ট; যদ্দ্বারা আপনার স্বাতন্ত্র্য ও বিশেষ মর্যাদা প্রকাশ পায়। সেগুলোর মধ্যে কয়েকটি এই প্রথমত) আমি আপনার জন্য আপনার এই স্ত্রীগণকে (যারা বর্তমানে আপনার খিদমতে উপস্থিত আছেন এবং) আপনি যাঁদের মোহরানা আদায় করে দিয়েছেন (তাঁরা চার থেকে অধিক হওয়া সত্ত্বেও) হালাল করে দিয়েছি। (দ্বিতীয় হুকুম) আর সেসব নারীগণকেও (বিশেষভাবে হালাল করা হয়েছে) যারা আপনার মালিকানাধীন---যাদেরকে আল্লাহ্ পাক গনীমত হিসেবে প্রদান করেছেন (এই বিশেষ ধরনের বর্ণনা পরবর্তী আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় ও মাস'আলাসমূহ অধ্যায়ে আসছে। তৃতীয় হুকুম) আপনার চাচার কন্যাগণ ও আপনার ফুফুর কন্যাগণ (অর্থাৎ তাঁর পিতৃবংশীয় কন্যাগণ) এবং আপনার মামার কন্যাগণ ও খালার কন্যাগণ (অর্থাৎ মাতৃবংশীয়া কন্যাগণ; কিন্তু এসব বংশীয়া কন্যাগণ সবাই হালাল নয় বরং এদের মধ্যে কেবল তাঁরাই) যারা আপনার সংগে হিজরতও করেছেন (সংগে অর্থ যারা এই হিজরতের কাজে সহযোগিতা করেছেন এবং হিজরতও করেছেন। কিন্তু তা নবীজী (সা)-র সংগেই হতে হবে এমন কোন কথা নয়। এই শর্তানুসারে যারা একেবারে হিজরতই করেনি তারা বাদ পড়ে গেল। চতুর্থ হুকুম) সে মুসলিম নারীও (আপনার পক্ষে হালাল করা হয়েছে) যে কোন প্রকারের বিনিময় ব্যতীত (অর্থাৎ বিনা মোহরানায়) নিজেকে নবীর নিকট সমর্পণ করে দেয় (অর্থাৎ নবীর সাথে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হতে চায়) অবশ্যই এই শর্তে যে, নবীও তাঁকে পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ করতে রাযী হন। (মুসলিম শর্তের পরিপ্রেক্ষিতে অবিশ্বাসী কাফির নারী বাদ পড়ে গেল। এদের সাথে নবীজীর বিয়ে জায়েয নয় এবং পঞ্চম হুকুম এই যে) এসব হুকুম আপনার জন্য নির্দিষ্ট, অন্যান্য মু'মিনদের জন্য নয় (তাদের জন্য ভিন্ন হুকুম।) বস্তুত সেসব হুকুমও আমার জ্ঞাত (এবং কোরআনের আয়াত ও হাদীসসমূহের মাধ্যমে অন্যান্যদেরকেও এ সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে) যা আমি এদের সাধারণ মু'মিনদের উপর এদের স্ত্রীগণের ও দাসীদের জন্য নির্ধারিত করে দিয়েছি (যা এসব হুকুম থেকে আলাদা, যেগুলোর মধ্যে নমুনা হিসেবে উপরে إِذَا نَكَحْتُمُ আয়াতেও একটির উল্লেখ রয়েছে। সেখানে تَمَسُّوهُنَّ শব্দের মাধ্যমে প্রত্যেক বিয়েতে মোহরানা অবশ্য দেয় বলে প্রমাণিত হয়। চাই তা হাকীকীভাবে হোক বা হুকুমীভাবে, চাই তা প্রস্তাব ও চুক্তিপত্রের মাধ্যমে হোক বা শরীয়তের হুকুম অনুসারে হোক। চতুর্থ হুকুম অনুসারে নবীজীর বিয়ে মোহরানা বিমুক্ত রইল। এরূপ বিশেষীকরণ এজন্য) যাতে আপনার উপর কোন প্রকারের অসুবিধা ও প্রতিকূলতা আরোপিত না হয় (সুতরাং যেসব বিশেষ

হুকুমের মধ্যে অন্যান্যগুলির চাইতে ব্যাপকতা ও নমনীয়তার অবকাশ রয়েছে যথা—প্রথম ও চতুর্থ হুকুম—এতে কোন প্রকারের অসুবিধা ও সংকীর্ণতা না থাকার কথা তো সুস্পষ্ট। যেগুলোতে বাহ্যত সীমাবদ্ধতা ও সংকীর্ণতা রয়েছে যথা—তৃতীয় ও পঞ্চম হুকুম। সেক্ষেত্রে অসুবিধা ও সীমাবদ্ধতা না থাকার অর্থ এই যে, আমি এ সীমাবদ্ধতা ও অসুবিধা কতকগুলো মঙ্গলের পরিপ্রেক্ষিতে আরোপ করেছি। যদি এ শর্ত ও সীমাবদ্ধতা না থাকত তবে সেসব কল্যাণ লোপ পেয়ে যেত। এমতাবস্থায় আপনি কি অসুবিধার সম্মুখীন হতেন তা আমার জানা। বস্তুত এসব কল্যাণ ও মঙ্গলসমূহের কথা চিন্তা করেও আপনার প্রতি কিছু শর্তাবলী ও সীমাবদ্ধতা আরোপ করা হয়েছে এবং দ্বিতীয় হুকুম সংক্রান্ত আলোচনা 'আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় ও মাস'আলাসমূহ' অধ্যায়ে করা হয়েছে। এবং অসুবিধা দূরীকরণের বিবেচনা যে কেবল এসব বিশেষ হুকুমসমূহের বেলায়ই করা হয়েছে তা নয়। বরং যেসব হুকুম সাধারণ মু'মিনদের সম্পর্কিত সেগুলোর ক্ষেত্রেও এ বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়েছে। কেননা ) আল্লাহ্ পাক—মহা ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। [ সুতরাং দয়াপরবশ হয়ে যাবতীয় হুকুমের ক্ষেত্রে সহজ-সাধ্যতা ও অনায়াস লব্ধতার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রেখেছেন এবং এসব সহজ সরল হুকুমসমূহ পালনের ক্ষেত্রে কোন প্রকারের শিথিলতা ও নির্লিপ্ততা পরিদৃষ্ট হলে প্রায় সময়ই তা ক্ষমা করে দেন—যা তাঁর অন্যান্য দয়া অনুকম্পার দলীল—যা হুকুমসমূহ সহজীকরণ ও অসুবিধা দূরীকরণের মূল। এ পর্যন্ত তো সেসব নারীগণের শ্রেণী বিন্যাসের আলোচনা ছিল যাদেরকে তাঁর (সা) জন্য হালাল করে দেওয়া হয়েছে। এসব হালালকৃত নারীগণের মধ্য থেকে বিভিন্ন সময়ে যত সংখ্যক তাঁর খিদমতে উপস্থিত থাকবে তাদের কি কি হুকুম—পরবর্তী পর্যায়ে সেসব আলোচনা করা হয়েছে। অতঃপর ষষ্ঠ হুকুম প্রসঙ্গে ইরশাদ হয়েছে যে ] এদের মধ্যে আপনি যাকে চান ( এবং যতক্ষণ পর্যন্ত চান ) নিজ থেকে দূরে রাখুন। ( অর্থাৎ তাকে পালা প্রদান না করুন ) এবং যাকে চান ( যতক্ষণ ও যতদিন পর্যন্ত চান ) নিজের সান্নিধ্যে রাখুন ( অর্থাৎ তাকে পালা প্রদান করুন ) এবং যাদেরকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন তাদের মধ্য থেকে পুনরায় যদি কাউকে আহবান করতে চান তবুও আপনার কোন দোষ হবে না। ( এই কথার মর্মার্থ এই যে, মহীয়সী স্ত্রীগণের সাথে রাত্রি যাপনের ক্ষেত্রে পালার নীতি অনুসরণ করা আপনার উপর ওয়াজিব নয়। এতে এক বিশেষ প্রয়োজনীয় কল্যাণ নিহিত রয়েছে তা এই যে ) এর ফলে এই ( বিবিগণের ) চোখ শীতল থাকবে বলে বিশেষভাবে আশা করা যায়। ( অর্থাৎ প্রফুল্ল ও আনন্দিত থাকবে। ) ভগ্ন হৃদয় ও ভারাক্রান্তচিত্ত হবে না এবং আপনি তাদেরকে যা কিছু প্রদান করবেন তাতেই তারা সন্তুষ্ট ও তৃপ্ত থাকবে। ( কেননা অধিকার ও প্রাপ্যের দাবিই সাধারণত মনোকষ্টের কারণ হয়ে থাকে। যখন একথা জানা থাকবে যে, যতটুকু ধন-সম্পদ বা আকর্ষণ বিতরিত হয়েছে তা নিতান্তই দয়া ও অনুকম্পা—এটা আমাদের অবশ্য প্রাপ্য কোন অধিকার নয়, তবে কারো কোন প্রকারের আপত্তি বা অভিযোগ থাকবে না এবং দাসীদের পালার অধিকার না থাকার কথা সর্বজনজ্ঞাত ) এবং ( হে মুসলিমগণ! এই বিশেষ হুকুমের কথা শুনে মনে মনে এ প্রশ্ন যেন না জাগে যে, এসব হুকুম ব্যাপক তবে সকলের জন্য কেন হলো না, যদি এমনটি হয়

তবে) তোমাদের সকল কথার জন্যই আল্লাহ্ পাক শাস্তি প্রদান করবেন। কেননা ইহা আল্লাহ্ পাক সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা এবং রসূলুল্লাহ্ (সা)-র প্রতি হিংসা পোষণের নামান্তর —তা শাস্তি প্রয়োগের কারণ) এবং আল্লাহ্ তা'আলা (কেবল এগুলো কেন) সবকিছু জ্ঞাত (এবং প্রশ্নের উত্থাপক ও তর্কের অবতারণাকারীদের প্রতি নগদ ও ত্বরিত শাস্তি না পৌঁছা থেকে এ কথা বোঝা যায় না যে, তিনি এ সম্পর্কে জ্ঞাত নন। বরং এর কারণ এই যে, তিনি) স্থির ও সহনশীলও বটে (তাই কখনো কখনো শাস্তি প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে অবকাশ দেন। পরবর্তী পর্যায়ে নবীজী (সা) সংশ্লিষ্ট অবশিষ্ট বিশেষ নির্দেশাদি সম্পর্কে ইরশাদ হচ্ছে। তন্মধ্যে কতক তো উপরোল্লিখিত নির্দেশাবলীরই ফলশ্রুতি আবার কতকগুলো নতুন। ইরশাদ হচ্ছে যে, উপরে তৃতীয় ও পঞ্চম হুকুমে বিবাহিত স্ত্রীগণ সম্পর্কে যে হিজরত ও ঈমানের শর্ত আরোপ করা হয়েছে—ফলে) এদের ছাড়া অপরাপর স্ত্রীলোকগণ (যাদের এ শর্ত ও বৈশিষ্ট্য পাওয়া যাবে না) আপনার জন্য হালাল নয়। (অর্থাৎ জ্ঞাতি ও নিকটবর্তীদের মাঝে হিজরতকারিণীগণ ভিন্ন কেউ হালাল নয় এবং অন্যান্য রমণীগণের মধ্যে মু'মিন ব্যতীত কেউ হালাল নয়। এটা তো উপরোক্ত হুকুমের উপসংহার) এবং (পরবর্তী পর্যায়ে সপ্তম—নতুন হুকুম তা এই যে,) আপনার পক্ষে বর্তমান স্ত্রীগণের স্থলে অপর স্ত্রীগণকে গ্রহণ করা বৈধ হবে না। (এরূপভাবে যে আপনি এদের কাউকে তালাক দিয়ে অপর কাউকে সে স্থলে গ্রহণ করে নেন। অবশ্য এদেরকে তালাক না দিয়ে যদি অপর কাউকে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করেন তবে কোন বাধা নেই। অনুরূপভাবে পরিবর্তনের ইচ্ছা ব্যতীতও যদি কাউকে তালাক দেন তবুও কোন আপত্তি নেই। تبدل শব্দ দ্বারা একথাই বোঝা যায় যে, কেবল পরিবর্তনের উদ্দেশ্যেই তালাক দেয়া নিষিদ্ধ) যদিও আপনাকে তাদের (অপর রমণীগণের) সৌন্দর্য মুগ্ধ ও বিমোহিত করে থাকে। কিন্তু যারা আপনার মালিকানাধীন দাসী (তারা পঞ্চম ও সপ্তম হুকুমের আওতা বহির্ভূত। অর্থাৎ তারা 'কিতাবীয়াহ্' কোরআন ব্যতীত অন্য কোন ঐশী গ্রন্থে বিশ্বাসী এবং অনুসারী হলেও হালাল এবং এক্ষেত্রে পরিবর্তনও জায়েয) এবং মহান আল্লাহ্ প্রত্যেক বস্তুর (মাহাত্ম্য, ফলাফল, প্রতিক্রিয়া ও গুণাগুণের) পরিপূর্ণ রক্ষক। (সুতরাং এ সব হুকুমের মাঝে অবশ্যই কল্যাণ ও মঙ্গল নিহিত রয়েছে, যদিও তা সাধারণ মানুষের বোধগম্যাতীত। তাই এ সম্পর্কে কারো প্রশ্ন উত্থাপনের অধিকার, অবকাশ বা যৌক্তিকতা নেই)।

**আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়**

উল্লিখিত আয়াতসমূহে বিয়ে ও তালাক সংশ্লিষ্ট এমন সাতটি হুকুমের আলোচনা রয়েছে যেগুলো কেবল রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্য নির্দিষ্ট এবং এরূপ বিশেষীকরণ রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর স্বতন্ত্র মর্যাদা ও বিশেষ সম্মানের পরিচায়ক। এগুলোর মধ্যে কতক হুকুম তো এমন যে রসূলুল্লাহ্র সাথে যেগুলোর বিশেষীকরণ একেবারে স্পষ্ট ও জাজ্বল্যমান। আবার কতক এমন সেগুলো যদিও সমগ্র মুসলমানের প্রতি প্রযোজ্য কিন্তু তাতে এমন কিছু

ছোট খাট শর্তাবলী রয়েছে, যা কেবল রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্য নির্দিষ্ট। এখন সেগুলোর বিস্তারিত বর্ণনা দেখুন।

**প্রথম হুকুম ঃ**—إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ

অর্থাৎ আমি আপনার জন্য আপনার বর্তমান স্ত্রীগণকে, যাদের মোহরানা আদায় করে দিয়েছেন, হালাল করে দিয়েছি। এ হুকুম বাহ্যত সমস্ত মুসলমানদের জন্য প্রযোজ্য। কিন্তু এতে বিশেষীকরণের কারণ এই যে, আয়াত অবতীর্ণ হওয়াকালে তাঁর (সা) সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ চারের অধিক স্ত্রী ছিলেন। কিন্তু সাধারণ মুসলমানের পক্ষে এক সঙ্গে চারের অধিক স্ত্রী রাখা হালাল নয়। সুতরাং তার জন্য এক সাথে চারের অধিক স্ত্রী হালাল করে দেওয়া কেবল তাঁরই বৈশিষ্ট্য ছিল।

আর এ আয়াতে যে اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ বলা হয়েছে, এটা হালাল হওয়ার শর্ত নয় বরং বাস্তব ঘটনার প্রকাশ মাত্র যে, যত মহিলা নবীজী (সা)-র সাথে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়েছেন, নবীজী (সা) তাঁদের সবার মোহরানা নগদ আদায় করে দিয়েছেন, বাকি রাখেন নি। তাঁর (সা) স্বভাবই এরূপ ছিল যে, যে জিনিস আদায়ের দায়িত্ব তাঁর উপর আরোপিত ছিল তা কালবিলম্ব না করে তাৎক্ষণিকভাবে আদায় করে দায়মুক্ত হয়ে যেতেন, অনর্থক বিলম্ব করতেন না। এ ঘটনা প্রকাশের মাঝে সাধারণ মুসলমানদের জন্য তার অনুরূপ করার প্রেরণা রয়েছে।

**দ্বিতীয় হুকুম ঃ**—وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ অর্থাৎ তাঁর (সা) মালিকানাধীনে যেসব নারী রয়েছে তাঁর (সা) জন্য হালাল। এ আয়াতে أَفَا শব্দের উৎপত্তি হয়েছে فَيْءٌ ধাতু থেকে—পারিভাষিক অর্থে فَيْءٌ সে সব মালকে বোঝায় যা কাফিরদের থেকে বিনাযুদ্ধে বা সন্ধিসূত্রে লাভ করা হয়। আবার কখনো فَيْءٌ শব্দ সাধারণ গনীমতের মাল অর্থেও ব্যবহৃত হয়। বক্ষ্যমাণ আয়াতে এর উল্লেখ কোন শর্ত হিসেবে নয় যে আপনার জন্য কেবল সেসব দাসীই হালাল যা 'ফায়' ( فَيْءٌ ) বা গনীমতের মাল হিসেবে আপনার অংশে পড়েছে। বরং তিনি যাদেরকে মূল্যের বিনিময়ে খরিদ করেছেন তারাও এর অন্তর্গত।

কিন্তু এই হুকুমে বাহ্যিকভাবে রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কোন স্বাতন্ত্র্য বা বৈশিষ্ট্য নেই, এ হুকুম সমগ্র উম্মতের জন্য। যে দাসী গনীমতের মাল হিসেবে ভাগে পড়ে বা দাম দিয়ে খরিদ করা হয় তা তাদের জন্য হালাল। কিন্তু সমগ্র আয়াতের বর্ণনাভংগি এটাই চায় যে, উক্ত আয়াতসমূহে যেসব হুকুম রয়েছে তাতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে কিছু না কিছু বিশেষীকরণ অবশ্যই রয়েছে। এজন্যই রূহুল মা'আনীতে দাসীদের হালাল হওয়া

প্রসঙ্গেও রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এক বৈশিষ্ট্য এরূপ বর্ণনা করা হয়েছে যে, যেরূপভাবে আপনার পরে আপনার মহীয়সী স্ত্রীগণের বিয়ে কারো সাথে জায়েয নয়, অনুরূপভাবে যে দাসীকে আপনার জন্য হালাল করা হয়েছে আপনার পরে সেও অন্য কারো জন্য হালাল হবে না। যেমন হযরত মারিয়া কিবতিয়া (রা)-কে রোম সম্রাট মাকুক্কাস উপঢৌকন হিসেবে আপনার খিদমতে পাঠিয়েছিলেন। সুতরাং যেমন করে তাঁর (সা) পরে মহীয়সী স্ত্রীগণের কারো সাথে বিয়ে জায়েয ছিল না, এদের বিয়েও কারো সাথে জায়েয রাখা হয়নি।

হযরত হাকীমুল উম্মত (র) 'বয়ানুল কোরআনে'র মাঝে আরো দুটি বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন, যা উল্লিখিত বৈশিষ্ট্য থেকে অধিক স্পষ্ট।

প্রথমত রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে হক তা'আলার পক্ষ থেকে এ বিশেষ ইখতিয়ার দেওয়া হয়েছিল যে, গনীমতের মাল বন্টনের পূর্বেই তিনি এগুলো থেকে কোন জিনিস নিজের জন্য পছন্দ করে রেখে দিতে পারতেন। যা তাঁর (সা) বিশেষ মালিকানা স্বত্বে পরিণত হতো। এই বিশেষ বস্তুকে পরিভাষায় صفى النبى ( নবীজীর পছন্দ ) বলে আখ্যায়িত করা হতো। যেমন খায়বার যুদ্ধের গনীমত থেকে হুযূর (সা) হযরত সাফিয়া (রা)-কে নিজের জন্য নির্দিষ্ট করে নিয়েছিলেন। সুতরাং দাসী সংশ্লিষ্ট মাস'আলার ক্ষেত্রে এটা কেবল হযরতেরই (সা) বৈশিষ্ট্য ছিল।

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য এই যে, 'দারুল হরবের' কোন অমুসলিমের পক্ষ থেকে যদি কোন হাদিয়া ( উপঢৌকন ) মুসলমানদের আমিরুল মু'মিনীনের নামে প্রেরণ করা হয় তবে তার মালিক আমিরুল মু'মিনীন হন না, বরং শরীয়ত অনুসারে তা বায়তুল মালের স্বত্বে পরিণত হয়। পক্ষান্তরে নবীজী (সা)-র জন্য এরূপ হাদিয়া হালাল করে দেওয়া হয়েছিল। যেমন মারিয়া কিবতিয়ার (রা) ঘটনা—যাঁকে সম্রাট মাকুক্কাস হাদিয়া রূপে তাঁর খিদমতে প্রেরণ করার পর তিনি তাঁর (সা) মালিকানা স্বত্বে পরিণত হয়েছিলেন।

**তৃতীয় হুকুম :** بَنٰتِ عَمِّكَ وَبَنٰتِ عَمّٰتِكَ الا يه এ আয়াতে عم ও خال একবচন এবং عمات ও خالات বহুবচন রূপে গ্রহণের অনেক কারণ আছে বলে আলিমগণ বর্ণনা করেছেন। তফসীরে রূহুল মা'আনী, আবূ হাইয়্যান বর্ণিত এ কারণ গ্রহণ করেছেন যে, আরবী পরিভাষাই এরূপ—আরবী কবিতাই এর প্রমাণ—যাতে এর বহুবচন ব্যবহৃত হয় না, একবচনই ব্যবহৃত হয়।

আয়াতের মর্মার্থ এই যে, আপনার জন্য চাচা ও ফুফু এবং মামা ও খালার কন্যাগণকে হালাল করে দেওয়া হয়েছে। চাচা ও ফুফুর মাঝে পিতৃ বংশীয় মেয়ে এবং মামা ও খালার মাঝে মাতৃবংশীয়া সকল মেয়ে তাদেরকে বিবাহ করার বৈধতা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র বিশেষত্ব নয়; বরং সকল মুসলমানের জন্য তাদেরকে বিবাহ করা হালাল। কিন্তু তাঁরা আপনার সাথে মক্কা থেকে হিজরত করেছে—এ কথাটি রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বৈশিষ্ট্য।

সারকথা এই যে, সাধারণ উম্মতের জন্য পিতৃ ও মাতৃকুলের এসব কন্যা কোন শর্ত ছাড়াই হালাল—হিজরত করুক অথবা না করুক; কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্য কেবল তাঁরাই হালাল, যারা তাঁর সাথে হিজরত করে। 'সাথে হিজরত' করার জন্য সফরে সঙ্গে থাকা অথবা একই সময়ে হিজরত করা জরুরী নয়, বরং যে কোন প্রকারে রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ন্যায় হিজরত করাই উদ্দেশ্য। ফলে এসব কন্যার মধ্যে যারা কোন কারণে হিজরত করেনি, তাদেরকে বিবাহ করা রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্য হালাল রাখা হয়নি। রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চাচা আবূ তালিবের কন্যা উম্মে হানী (রা) বলেনঃ আমি মক্কা থেকে হিজরত না করার কারণে আমাকে বিবাহ করা রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্য হালাল ছিল না। আমি তোলাকাদের মধ্যে গণ্য হতাম। মক্কা বিজয়ের সময় রসূলুল্লাহ্ (সা) যাদেরকে হত্যা অথবা বন্দী না করে মুক্ত করে দিয়েছিলেন, তাদেরকে 'তোলাকা' বলা হত। (রূহুল মা'আনী, জাসসাস)

রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে বিবাহের জন্য হিজরতের উপরোক্ত শর্ত কেবল মাতৃ ও পিতৃবংশীয় কন্যাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল; সাধারণ উম্মতের মহিলাদের ক্ষেত্রে হিজরতের শর্ত ছিল না; বরং তাদের শুধু মুসলমান হওয়াই যথেষ্ট ছিল। পরিবারের মেয়েদের ক্ষেত্রে হিজরতের শর্ত আরোপ করার রহস্য সম্ভবত এই যে, পরিবারের মেয়েদের মধ্যে সাধারণত বংশগত কৌলিন্যের গর্ব ও অহমিকা বিদ্যমান থাকে। রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহধর্মিণী হওয়ার জন্য এটা সমীচীন নয়। হিজরতের শর্ত আরোপ করে এই গর্ব ও অহমিকার প্রতিকার করা হয়েছে। কারণ হিজরত কেবল সেই নারীই করবে, যে আল্লাহ্ ও রসূলের ভালবাসাকে গোটা পরিবার, দেশ ও বিষয় সম্পত্তির ভালবাসার উপর প্রাধান্য দেবে। এছাড়া হিজরতের সময় মানুষ নানাবিধ দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন হয় এবং আল্লাহ্র পথে সহ্য করা দুঃখকষ্ট সংশোধনে বিশেষ সহায়ক হয়ে থাকে।

মোটকথা এই যে, মাতৃ-পিতৃকুলের মেয়েদেরকে বিবাহ করার বেলায় রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্য একটি বিশেষ শর্ত ছিল। তা এই যে, সংশ্লিষ্ট মেয়েদের মক্কা থেকে হিজরত করতে হবে।

**চতুর্থ বিধান ঃ**—وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ

অর্থাৎ যদি কোন মুসলমান মহিলা নিজেকে আপনার কাছে নিবেদন করে, মানে দেনমোহর ব্যতিরেকেই আপনার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে চায় এবং আপনিও তাকে বিবাহ করতে ইচ্ছুক হন, তবে আপনার জন্য দেনমোহর ব্যতীতও বিবাহ হালাল। এই বিধান বিশেষভাবে আপনার জন্য—অন্য মু'মিনদের জন্য নয়।

উপরোক্ত বিধান যে একান্তভাবে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র বৈশিষ্ট্য, তা বর্ণনাসাপেক্ষ নয়। কেননা, সাধারণ লোকের জন্য বিবাহে দেনমোহর অপরিহার্য শর্ত। এমনকি, বিবাহের সময় যদি কোন নারী বলে, দেনমোহর নেব না কিংবা কোন পুরুষ বলে, দেনমোহর দেব না—এই শর্তে বিবাহ করছি, তবে তাদের এসব উক্তি ও শর্ত শরীয়তের আইনে অসার হবে এবং 'মোহরে মিসল' ওয়াজিব হবে। একমাত্র রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিশেষ মর্যাদার পরিপ্রেক্ষিতে দেনমোহর ব্যতিরেকেই বিবাহ হালাল করা হয়েছে, যদি নারী দেনমোহর ব্যতীত বিবাহ করতে আগ্রহী হয়।

**জ্ঞাতব্য ঃ** উপরোক্ত বিধান অনুযায়ী রসূলুল্লাহ্ (সা) দেনমোহর ব্যতিরেকে কোন বিবাহ করেছিলেন কি না, এ ব্যাপারে আলিমগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, এরূপ কোন ঘটনা সংঘটিত হওয়ার প্রমাণ নেই। এই উক্তির সারকথা এই যে, তিনি কোন মহিলাকে দেনমোহর ব্যতিরেকে বিবাহ করেন নি। পক্ষান্তরে কেউ কেউ এরূপ বিবাহ সপ্রমাণ করেছেন।---( রূহুল-মা'আনী )

এই বিধানের সাথে সম্পৃক্ত خَالِصَةً لَّكَ বাক্যটিকে কেউ কেউ কেবল চতুর্থ বিধানের সাথেই বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত বলেছেন। কিন্তু 'যমখশরী' প্রমুখ তফসীরবিদ একে উল্লিখিত সকল বিধানের সাথে জুড়ে দিয়েছেন অর্থাৎ সবগুলো বিধানই রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বৈশিষ্ট্য। পরিশেষে বলা হয়েছে ঃ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ ---

আপনার অসুবিধা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে আপনার জন্য এসব বিশেষ বিধান দেওয়া হল। উল্লিখিত বিশেষ বিধানসমূহের প্রথম বিধান হচ্ছে চারের অধিক পত্নী রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্য হালাল এবং চতুর্থ বিধান হচ্ছে দেনমোহর ব্যতিরেকে বিবাহ করা হালাল। এই বিধানদ্বয়ের মধ্যে অসুবিধা দূরীকরণ এবং অতিরিক্ত সুবিধা দানের বিষয়টি বর্ণনা সাপেক্ষ নয়। কিন্তু অবশিষ্ট দ্বিতীয়, তৃতীয় ও পঞ্চম বিধানে বাহ্যত তাঁর উপর অতিরিক্ত কড়াকড়ি আরোপ করা হয়েছে, যার ফলে অসুবিধা আরও বৃদ্ধি পাওয়ার কথা। কিন্তু এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যদিও বাহ্যত এসব কড়াকড়ি অসুবিধা বৃদ্ধি করে; কিন্তু এতে আপনার অনেক উপযোগিতার প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে। এসব কড়াকড়ি না থাকলে আপনি অনেক প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতেন, যা মনোকষ্টের কারণ হত। তাই অতিরিক্ত কড়াকড়ির মধ্যেও আপনার অসুবিধা দূরীকরণই উদ্দেশ্য।

**পঞ্চম বিধান ঃ** আয়াতের مِنْ مُّؤْمِنَةٍ শব্দ থেকে বোঝা যায়---তা এই যে, সাধারণ মুসলমানদের জন্য ইহুদী ও খৃস্টান নারীদেরকে বিবাহ করা কোরআনের বর্ণনা অনুযায়ী হালাল হলেও রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্য হালাল নয়; বরং এ ক্ষেত্রে নারীর ঈমানদার হওয়া শর্ত।

রসূলে করীম (সা)-এর উপরোক্ত পাঁচটি বিশেষ বিধান বর্ণনা করার পর সাধারণ মুসলমানদের বিধান সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছেঃ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ অর্থাৎ সাধারণ মুসলমানদের বিবাহের জন্য আমি যা ফরয করেছি, তা আমি জানি---উদাহরণত সাধারণ মুসলমানদের বিবাহ দেনমোহর ব্যতিরেকে হতে পারে না এবং ইহুদী ও খৃস্টান নারীদের সাথে তাদের বিবাহ হতে পারে। এরূপভাবে পূর্বোক্ত বিধানসমূহে যেসব কড়াকড়ি ও শর্ত রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিবাহের জন্য জরুরী, সেগুলো অন্যদের বেলায় প্রযোজ্য নয়।

অবশেষে বলা হয়েছে لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ---অর্থাৎ বিবাহের ব্যাপারে আপনাকে এসব বিশেষ বিধান দেয়ার কারণ অসুবিধা দূর করা। যেসব কড়াকড়ি ও শর্ত অন্য মুসলমানদের তুলনায় আপনার প্রতি অতিরিক্ত আরোপ করা হয়েছে, সেগুলোতে বাহ্যত এক প্রকার অসুবিধা থাকলেও এগুলোর অন্তর্নিহিত উপযোগিতা ও রহস্যের প্রতি লক্ষ্য করলে এগুলোও আপনার আত্মিক পেরেশানি ও মনোকষ্ট দূর করার উদ্দেশ্যেই আরোপিত হয়েছে।

এ পর্যন্ত বিবাহ সম্পর্কিত রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পাঁচটি বিশেষ বিধান বর্ণিত হয়েছে। অতপর এগুলোর সাথে সম্পর্কযুক্ত আরও দুটি বিধান বির্ণিত হচ্ছে। উদাহরণত **ষষ্ঠ বিধান** تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ -- تُرْجِي শব্দটি ارجاء থেকে উদ্ভূত। অর্থ পেছনে রাখা এবং تُؤْوِي শব্দটি ايواء থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ নিকটে আনা। আয়াতের অর্থ এই যে, আপনি বিবিগণের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা দূরে সরিয়ে রাখতে পারেন এবং যাকে ইচ্ছা কাছে রাখতে পারেন। এটা রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্য বিশেষ বিধান। সাধারণ উম্মতের মধ্যে কোন ব্যক্তির একাধিক পত্নী থাকলে সকলের মধ্যে সমতা বিধান জরুরী এবং বৈষম্যমূলক আচরণ করা হারাম। সমতার মানে ভরণ-পোষণে ও রাত্রি যাপনে সমতা করা অর্থাৎ প্রত্যেক স্ত্রীর সাথে সমান সংখ্যক রাত্রি যাপন করতে হবে---কম বেশি করা হারাম। কিন্তু এ ব্যাপারে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে পূর্ণ ক্ষমতা দান করে পত্নীদের মধ্যে সমতা বিধান করা থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে এবং আয়াতের শেষে আরও ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে যে, আপনি যে পত্নীকে একবার দূরে রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, ইচ্ছা করলে তাকে পুনরায় কাছে রাখতে পারেন। وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ বাক্যের অর্থ তা-ই।

আল্লাহ্ তা'আলা রসূলে করীম (সা)-এর সম্মানার্থে তাঁকে পত্নীদের মধ্যে সমতা বিধান করার হুকুম থেকে মুক্ত রেখেছেন। কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সা) এই ব্যতিক্রম ও অনুমতি সত্ত্বেও কার্যত সর্বদাই সমতা বজায় রেখেছেন। ইমাম আবূ বকর জাসসাস বলেন, হাদীস থেকে এ কথাই জানা যায় যে, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পরও রসূলুল্লাহ্ (সা) বিবিগণের মধ্যে সমতা রক্ষামূলক আচরণের প্রতি সর্বদা লক্ষ্য রাখতেন। অতপর ইমাম জাসসাস স্বীয় সনদ সহকারে মসনদে আহমদ, তিরমিযী, নাসায়ী, আবূ দাউদ ইত্যাদি কিতাবে বর্ণিত হযরত আয়েশা (রা) থেকে এই হাদীস উল্লেখ করেছেন ঃ

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل فيقول اللهم هذا قسمى فيما املك فلا تلمنى فيما لا املك قال ابو داؤد يعنى القلب

রসূলুল্লাহ্ (সা) সকল পত্নীর মধ্যে সমতা বিধান করতেন এবং এই দোয়া করতেন, ইয়া আল্লাহ্! যে বিষয়ে আমার ইখতিয়ার আছে, তাতে আমি সমতা বিধান করলাম, (অর্থাৎ ভরণ-পোষণ ও রাত্রি যাপন) কিন্তু যে ব্যাপারে আমার ইখতিয়ার নেই, সে ব্যাপারে আমাকে তিরস্কার করবেন না (অর্থাৎ আন্তরিক ভালবাসা কারও প্রতি বেশি এবং কারও প্রতি কম থাকার ব্যাপারে আমার ইখতিয়ার নেই)।

সহীহ্ বুখারীর রেওয়ায়েতে হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ্ (সা) পত্নীদের কাছে যাওয়ার ব্যাপারে পালা নির্দিষ্ট করে রেখেছিলেন। সেই পালা অনুযায়ী কোন পত্নীর কাছে যাওয়ার ব্যাপারে কোন ওযর দেখা দিলে তিনি তার কাছ থেকে অনুমতি গ্রহণ করতেন। অথচ সে সময়ে تُؤْوِىْ اِلَيْكَ আয়াতখানি অবতীর্ণ হয়ে গিয়েছিল, যাতে পত্নীদের মধ্যে সমতা বিধানের দায়িত্ব থেকে তাঁকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছিল।

এ হাদীসটিও হাদীস গ্রন্থসমূহে সুবিদিত যে, ওফাতের পূর্বে রুগ্নাবস্থায় প্রত্যহ পত্নীগণের গৃহে গমন করা তাঁর পক্ষে কঠিন হয়ে গেলে তিনি সকলের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে হযরত আয়েশা (রা)-র গৃহে শয্যা গ্রহণ করেছিলেন।

পয়গম্বরগণ বিশেষত রসূলে করীম (সা)-এর অভ্যাস এটাই ছিল যে, যেসব কাজে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে তাঁকে তাঁরই সুবিধার্থে 'রুখসত' তথা অব্যাহতি দান করা হত, আল্লাহ্ তা'আলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশস্বরূপ তিনি সেসব কাজে 'আযীমত' পালন করে সুবিধা ভোগ করা থেকে বিরত থাকতেন এবং 'রুখসত' অর্থাৎ অব্যাহতিকে কেবল প্রয়োজনের মুহূর্তেই ব্যবহার করতেন।

ذٰلِكَ اَدْنٰى اَنْ تَقَرَّ اَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ——এতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে পত্নীগণের মধ্যে সমতা বিধানের আদেশ থেকে অব্যাহতি দান এবং তাঁকে সর্বপ্রকার ক্ষমতাদানের কারণ ও রহস্য বর্ণিত হয়েছে। এর রহস্য এই যে, এতে সকল পত্নীর চক্ষু শীতল থাকবে এবং তাঁরা যা পাবেন, তা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকবেন।

এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, এই বিধান তো বাহ্যত পত্নীগণের পছন্দ ও বাসনার বিপরীত হওয়ার কারণে তাদের মর্মবেদনার কারণ হতে পারে। একে পত্নীগণের সন্তুষ্টির কারণ কিরূপে আখ্যায়িত করা হল? এর জবাব তফসীরের সার-সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে যে, প্রকৃতপক্ষে অধিকারই অসন্তুষ্টির আসল কারণ হয়ে থাকে। কারও কাছে কিছু পাওনা থাকলে সে যদি তা আদায় করতে ত্রুটি করে তবেই পাওনাদার ব্যক্তি দুঃখকষ্টের সম্মুখীন হয়। কিন্তু যার কাছে কারও কোন পাওনা নেই, সে যদি সামান্য দয়াও প্রদর্শন করে, তবে প্রতিপক্ষ খুবই আনন্দিত হয়। এখানেও যখন বলা হয়েছে যে, পত্নীগণের মধ্য সমতা বিধান করা রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্য জরুরী নয়; বরং তিনি এ ব্যাপারে স্বাধীন, তখন তিনি যে পত্নীকে যতটুকু মনোযোগ ও সঙ্গদান করবেন, তাকে সে এক অনুগ্রহ ও দান মনে করে সন্তুষ্ট হবে।

অবশেষে বলা হয়েছে ঃ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا فِيْ قُلُوْبِكُمْ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَلِيْمًا ـ

—অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'আলা জানেন তোমাদের অন্তরে কি আছে। তিনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। উল্লিখিত আয়াতসমূহে এ পর্যন্ত রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিবাহের সাথে কোন না কোন দিক দিয়ে সম্পর্ক রাখে, এরূপ বিধানসমূহ বিধৃত হয়েছে। এরপরও এমনি ধরনের কতক বিধান বর্ণিত হবে। মধ্যস্থলে এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের অন্তরে যা আছে জানেন এবং তিনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। বাহ্যত পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বিষয়বস্তুর সাথে একথা কোন সম্পর্ক রাখে না। রূহুল মা'আনীতে বলা হয়েছে, বর্ণিত বিধানসমূহের মধ্যে রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্য চারের অধিক পত্নী গ্রহণের অনুমতি এবং দেনমোহর ব্যতিরেকে বিবাহের অনুমতি দেখে কারও মনে শয়তানী কুমন্ত্রণা সৃষ্টি হওয়ার আশংকা ছিল। তাই মধ্যস্থলে আলোচ্য আয়াত নির্দেশ দিয়েছে যে, মুসলমানরা যেন তাদের অন্তরকে এ ধরনের কুমন্ত্রণা থেকে বাঁচিয়ে রাখে এবং দৃঢ় বিশ্বাস রাখে যে, এসব বিশেষত্ব আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে, যা অনেক রহস্য ও উপযোগিতার উপর ভিত্তিশীল। এখানে কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করার অবকাশ নেই।

**রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সংসারবিমুখ জীবন ও বহু বিবাহ ঃ** ইসলামের শত্রুরা সব সময় বহু বিবাহ বিশেষত রসূলুল্লাহ্ (সা)-র বহু বিবাহকে সমালোচনার বিষয়-বস্তুতে পরিণত করে ইসলাম বিরোধিতার প্রয়াস পেয়েছে। কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সমগ্র জীবনালেখ্য সামনে রাখা হলে শয়তানও তাঁর রিসালতের বিপক্ষে কথা বলার অবকাশ পায় না। তাঁর জীবনালেখ্যে প্রমাণিত আছে যে, তিনি সর্বপ্রথম বিবাহ করেন পঁচিশ বছর বয়সে হযরত খাদীজা (রা)-কে, যিনি ছিলেন বিধবা, চল্লিশ বছর বয়স্কা ও সন্তানের জননী। এর আগে দুই স্বামীর ঘর করার পর তিনি রসূলুল্লাহ্ (সা)-র স্ত্রীরূপে আগমন করেছিলেন। অতপর রসূলুল্লাহ্ (সা) পঞ্চাশ বছরের বয়ঃক্রম পর্যন্ত এই বয়স্কা মহিলার সাথে সমগ্র যৌবন অতিবাহিত করেন। পঞ্চাশ বছরের এই বয়ঃক্রম মক্কাবাসীদের চোখের সামনে অতিবাহিত হয়। চল্লিশ বছর বয়সে নবুয়তের ঘোষণা

প্রচারিত হওয়ার পর মক্কা নগরীতে তাঁর বিরোধিতার সূচনা হয়। বিরোধী পক্ষ তাঁর উপর নির্যাতনের এবং তাঁর ছিদ্রান্বেষণের চেষ্টার কোন ত্রুটি রাখে নি। তাঁকে যাদুকর বলেছে, উন্মাদ বলেছে, কিন্তু পরম শত্রুর মুখ থেকেও কোন সময় এমন কথা বের হয়নি, যা তাঁর আল্লাহ্‌ভীতি ও চারিত্রিক পবিত্রতাকে সন্দেহযুক্ত করে দিতে পারে।

পঞ্চাশোর্ধ বয়সে হযরত খাদীজা (রা)-র ওফাতের পর হযরত সওদা (রা) তাঁর স্ত্রীরূপে আসেন---তিনিও বিধবা ছিলেন।

মদীনায় হিজরত এবং বয়স চুয়ান্ন বছর হওয়ার পর দ্বিতীয় হিজরীতে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) নববধূ বেশে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র গৃহে আগমন করেন। এর এক বছর পর হযরত হাফসা (রা)-র সাথে এবং কিছুদিন পর যয়নব বিনতে খুযায়মার সাথে তাঁর বিবাহ হয়। কয়েক মাস পর যয়নবের ইন্তেকাল হয়ে যায়। চতুর্থ হিজরীতে সন্তানের জননী ও বিধবা হযরত উম্মে সালমা (রা) তাঁর অন্তঃপুরে আসেন। পঞ্চম হিজরীতে হযরত যয়নব বিনতে জাহাশের সাথে আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশে তাঁর বিবাহ হয়। এ সম্পর্কে সূরা আহযাবের শুরুতে আলোচনা করা হয়েছে। তখন রসূলুল্লাহ্ (সা)-র বয়ঃক্রম ছিল আটান্ন বছর। অবশিষ্ট পাঁচ বছরে অন্যান্য পত্নী তাঁর হেরেমে প্রবেশ করেন। পয়গম্বরের পারিবারিক জীবন ও আচার-আচরণের সাথে অনেক ধর্মীয় বিধান সম্পৃক্ত থাকে। এই নয়জন পত্নীর মাধ্যমে ইসলাম প্রচারের কাজ কতটুকু অগ্রসর হয়েছে, তা অনুমান করতে হলে এটাই যথেষ্ট যে, একমাত্র হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) থেকে দু'হাজার দু'শ দশটি হাদীস এবং হযরত উম্মে সালমা (রা) থেকে তিনশ আটষট্টিটি হাদীস নির্ভরযোগ্য হাদীস গ্রন্থসমূহে সন্নিবেশিত রয়েছে। হযরত উম্মে সালমা (রা) বর্ণিত বিধানসমূহ ও ফতোয়া সম্পর্কে হাফেয ইবনে কাইয়্যেম "এলামুল-মুকেয়ীন" গ্রন্থে লিখেন ঃ এগুলো একত্রিত করা হলে একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থের আকার ধারণ করবে। দু'শতেরও অধিক সাহাবায়ে কিরাম হযরত আয়েশা সিদ্দীকার শিষ্য ছিলেন, যাঁরা তাঁর কাছ থেকে হাদীস, ফিকাহ ও ফতোয়া শিক্ষা করেছিলেন।

অনেক পত্নীকে নবী করীম (সা)-এর হেরেমে দাখিল করার পশ্চাতে তাদের পরিবারবর্গকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করার রহস্য নিহিত ছিল। রসূলে করীম (সা)-এর জীবনের এই সংক্ষিপ্ত চিত্রটি সামনে রাখা হলে কারও পক্ষে একথা বলার অবকাশ থাকে কি যে, এই বহুবিবাহ কোন মানসিক ও যৌন বাসনা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে ছিল ? এরূপ হলে যৌবনের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ অবিবাহিত অবস্থায় এবং তারপর একজন বিধবার সাথে অতিবাহিত করার পর জীবনের শেষভাগকে এ কাজের জন্য কেন বেছে নেয়া হল ? এ বিষয়বস্তুর পূর্ণ বিবরণ এবং শরীয়তগত, বুদ্ধিগত, প্রকৃতিগত ও অর্থনীতিগত দৃষ্টিকোণ থেকে বহুবিবাহ সম্পর্কিত পূর্ণাঙ্গ আলোচনা দ্বিতীয় খণ্ডে সূরা নিসার তৃতীয় আয়াতের তফসীরে করা হয়েছে।

**সপ্তম বিধান ঃ** لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ

أَزْوَاجٍ وَّلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ অর্থাৎ অতপর আপনার জন্য অন্য মহিলাকে বিবাহ করা হালাল নয় এবং বর্তমান পত্নীগণের মধ্যে কাউকে তালাক দিয়ে তার স্থলে অন্যকে বিবাহ করাও হালাল নয়।

এ আয়াতে مِنْ بَعْدُ শব্দের দু'রকম তফসীর হতে পারে--(১) সেই নারীগণের পরে যারা বর্তমানে আপনার বিবাহে আছে, অন্য কাউকে বিবাহ করা আপনার জন্য হালাল নয়। কতক সাহাবী ও তফসীরবিদ থেকেও এই তফসীর বর্ণিত আছে, যেমন হযরত আনাস (রা) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা নবী-পত্নীগণকে দু'টি বিষয়ের মধ্য থেকে যে কোন একটি বেছে নেওয়ার অধিকার দিয়েছিলেন---সাংসারিক ভোগবিলাস লাভের উদ্দেশ্যে রসূল (সা)-এর সঙ্গ ত্যাগ করা অথবা দুঃখ-কষ্ট ও সুখ যা-ই পাওয়া যায়, তাকে বরণ করে নিয়ে তাঁর স্ত্রী হিসাবে থাকা। সে মতে পুণ্যময়ী পত্নীগণ সকলেই অতিরিক্ত ভরণ-পোষণের দাবি পরিত্যাগ করে সর্বাবস্থায় রসূলুল্লাহ্ (সা)-র পত্নীত্বে থাকাকেই বেছে নেন। এরই পুরস্কারস্বরূপ আল্লাহ্ তা'আলা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সন্তাকেও এই নয় পত্নীর জন্য সীমিত করে দেন। ফলে তাঁদের ব্যতীত অন্য কাউকে বিবাহ করা বৈধ রইল না।---(রূহুল মা'আনী)

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা নবী-পত্নীগণকে একমাত্র তাঁর জন্যই নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন। ফলে তাঁর ওফাতের পরও তাঁরা অন্য কাউকে বিবাহ করতে পারতেন না। অনুরূপভাবে আল্লাহ্ তা'আলা রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে তাঁদের জন্যে নির্দিষ্ট করে দেন যে, তিনি তাঁদের ব্যতীত অন্য কোন নারীকে বিবাহ করতে পারবেন না। এক রেওয়ায়েতে হযরত ইকরামা (রা) থেকেও এই তফসীর বর্ণিত আছে।

(২) অপর এক রেওয়ায়েতে হযরত ইকরামা, ইবনে আব্বাস ও মুজাহিদ থেকে مِنْ بَعْدُ শব্দের দ্বিতীয় তফসীর مِنْ بَعْدِ الْاَصْنَافِ الْمَذْكُوْرَةِ বর্ণিত আছে। অর্থাৎ আয়াতের শুরুতে আপনার জন্য যত প্রকার নারী হালাল করা হয়েছে, তাঁদের ব্যতীত অন্য কোন প্রকার নারীকে বিবাহ করা আপনার জন্য হালাল নয়। উদাহরণত আয়াতের শুরুতে তাঁর পরিবারের নারীদের মধ্যে যারা মক্কা থেকে হিজরত করেছেন, কেবল তাঁদেরকেই হালাল করা হয়েছে এবং যাঁরা হিজরত করেন নি, তাঁদেরকে বিবাহ করা হালাল রাখা হয়নি। অনুরূপভাবে مُؤْمِنَةً তথা ঈমানদার হওয়ার শর্ত আরোপ করে কিতাবী নারীদেরকে বিবাহ করাও তাঁর জন্য অবৈধ সাব্যস্ত করা হয়েছে। সুতরাং مِنْ بَعْدُ শব্দের অর্থ এই যে, যে সব প্রকার নারী তাঁর জন্য হালাল করা হয়েছে,

কেবল তাঁদের মধ্যে আপনার বিবাহ হতে পারে। সাধারণত নারীদের মধ্যে মুসলমান হওয়াই শর্ত এবং পরিবারের নারীদের মধ্যে মুসলমান হওয়ার সাথে সাথে হিজরত করাও শর্ত। যাদের মধ্যে এই শর্তদ্বয় অনুপস্থিত, তাদেরকে বিবাহ করা হালাল নয়। এই তফসীর অনুযায়ী আলোচ্য বাক্যে কোন নতুন বিধান ব্যক্ত হয়নি, বরং পূর্বোক্ত বিধানেরই তাকীদ ও ব্যাখ্যা করা হয়েছে মাত্র। এ আয়াতের কারণে নয় জনের পর অন্য নারীকে বিবাহ করা হারাম হয়ে যায় নি ; বরং মু'মিন নয়, এমন নারীকে এবং হিজরত করেনি—পরিবারের এমন নারীকে বিবাহ করা নিষিদ্ধ হয়েছে মাত্র। অবশিষ্ট নারীগণকে আরও বিবাহ করার ব্যাপারে তাঁর ইখতিয়ার বহাল রয়েছে। হযরত আয়েশা সিদ্দীকার এক রেওয়ায়েতও এই দ্বিতীয় তফসীর সমর্থন করে, যদ্দ্বারা বোঝা যায় যে, আরও বিবাহ করার অনুমতি ছিল।

وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ - আলোচ্য আয়াতের দ্বিতীয় তফসীর অনুযায়ী এ বাক্যের সুস্পষ্ট অর্থ এই যে, বর্তমান স্ত্রীগণ ব্যতীত অন্য নারীদেরকে বর্ণিত শর্তাবলী সাপেক্ষে বিবাহ করা যদিও জায়েয, কিন্তু এটা জায়েয নয় যে, একজনকে তালাক দিয়ে তার স্থলে অন্যজনকে বহাল করবেন অর্থাৎ নিছক পরিবর্তন মানসে কোন বিবাহ বৈধ নয়। পরিবর্তনের নিয়ম ব্যতীত যত ইচ্ছা বিবাহ করতে পারেন।

পক্ষান্তরে প্রথম তফসীর অনুযায়ী অর্থ এই হবে যে, বর্তমান পত্নী তালিকায় নতুন কোন মহিলার সংযোজনও করতে পারবেন না এবং কাউকে পরিবর্তনও করতে পারবেন না অর্থাৎ একজনকে তালাক দিয়ে তার স্থলে অন্যজনকে বিবাহ করতে পারবেন না।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَىٰ
طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَٰكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ
فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ ۚ إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ
فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ ۖ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ ۚ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا
فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ۚ ذَٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ۚ
وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ

بَعْدِهٖٓ اَبَدًا ۭ اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمًا ۝ اِنْ تُبْدُوْا شَيْـــًٔا اَوْ تُخْفُوْهُ
فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا ۝ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِيْٓ اٰبَاۗىِٕهِنَّ وَلَآ
اَبْنَاۗىِٕهِنَّ وَلَآ اِخْوَانِهِنَّ وَلَآ اَبْنَاۗءِ اِخْوَانِهِنَّ وَلَآ اَبْنَاۗءِ اَخَوٰتِهِنَّ
وَلَا نِسَاۗىِٕهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ ۚ وَاتَّقِيْنَ اللّٰهَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ
عَلٰي كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدًا ۝

(৫৩) হে মু'মিনগণ! তোমাদেরকে অনুমতি দেওয়া না হলে তোমরা খাওয়ার জন্য আহার্য রন্ধনের অপেক্ষা না করে নবীর গৃহে প্রবেশ করো না। তবে তোমরা আহূত হলে প্রবেশ করো, অতপর খাওয়া শেষে আপনা আপনি চলে যেয়ো, কথাবার্তায় মশগুল হয়ে যেয়ো না। নিশ্চয় এটা নবীর জন্য কষ্টদায়ক। তিনি তোমাদের কাছে সংকোচ বোধ করেন; কিন্তু আল্লাহ্ সত্য কথা বলতে সংকোচ করেন না। তোমরা তাঁর পত্নীগণের কাছে কিছু চাইলে পর্দার আড়াল থেকে চাইবে। এটা তোমাদের অন্তরের জন্য এবং তাঁদের অন্তরের জন্য অধিকতর পবিত্রতার কারণ। আল্লাহ্র রসূলকে কষ্ট দেওয়া এবং তাঁর ওফাতের পর তাঁর পত্নীগণকে বিবাহ করা তোমাদের জন্য বৈধ নয়। আল্লাহ্র কাছে এটা গুরুতর অপরাধ। (৫৪) তোমরা খোলাখুলি কিছু বল অথবা গোপন রাখ, আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে সর্বজ্ঞ। (৫৫) নবী-পত্নীগণের জন্য তাঁদের পিতা-পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভগ্নিপুত্র, সমধর্মিণী নারী এবং অধিকারভুক্ত দাসদাসীগণের সামনে যাওয়ার ব্যাপারে গোনাহ্ নেই। নবী-পত্নীগণ, তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্ব বিষয় প্রত্যক্ষ করেন।

**তফসীরের সার-সংক্ষেপ**

হে মু'মিনগণ! তোমরা নবীর গৃহে (অযাচিতভাবে) প্রবেশ করো না, তবে যখন তোমাদেরকে আহারের জন্যে (আসার) অনুমতি দেওয়া হয় (তখন যাওয়া দূষণীয় নয়। কিন্তু তখনও যাওয়া) এভাবে (হওয়া চাই) যে, তোমরা আহার্য রন্ধনের অপেক্ষা করবে (অর্থাৎ দাওয়াত ছাড়া তো যাবেই না; দাওয়াত হলেও অনেক আগে যাবে না।) কিন্তু তোমরা (আহার্য প্রস্তুতির পর) আহূত হলে প্রবেশ করবে, অতপর খাওয়া শেষে উঠে চলে যাবে এবং কথাবার্তায় মশগুল হয়ে বসে থাকবে না। (কেননা, এটা নবীর জন্যে পীড়াদায়ক। তিনি তোমাদের কাছে সংকোচ বোধ করেন (এবং মুখে চলে যেতে বলেন না) কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা সত্য কথা বলতে (কোনরূপ) সংকোচ বোধ করেন না। (তাই সাফ সাফ বলে দেওয়া হয়েছে। এখন থেকে এই বিধান হচ্ছে

যে, নবী-পত্নীগণ তোমাদের কাছে পর্দা করবেন। তাই এখন থেকে) তোমরা তাঁর পত্নীগণের কাছে কিছু চাইলে পর্দার আড়াল থেকে (অর্থাৎ পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে সেখান থেকে) চাইবে। (বিনা প্রয়োজনে পর্দার কাছে যাওয়া এবং কথা বলাও উচিত নয়। তবে প্রয়োজনে কথা বলতে দোষ নেই; কিন্তু সামনাসামনি দেখা না হওয়া চাই।) এটা (চিরতরে) তোমাদের অন্তর এবং তাঁদের অন্তর পবিত্র থাকার প্রকৃষ্ট উপায়। (অর্থাৎ এ পর্যন্ত যেমন উভয় পক্ষের অন্তর পবিত্র, ভবিষ্যতেও তেমনি অপবিত্র হওয়ার আশংকা দূর হয়ে গেছে। নিষ্পাপ না হওয়ার কারণে এরূপ অপবিত্রতার আশংকা ছিল। পয়গম্বরকে পীড়া দেওয়া হারাম—এটা কেবল বিনা প্রয়োজনে আসন গেড়ে বসে থাকার মধ্যেই সীমিত নয়; বরং সর্বাবস্থায় বিধান এই যে,) আল্লাহ্‌র রসূলকে (যে কোনভাবে) কষ্ট দেওয়া এবং তাঁর ওফাতের পর তাঁর পত্নীগণকে বিবাহ্ করা তোমাদের জন্য বৈধ নয়। এটা আল্লাহ্‌র কাছে গুরুতর (গোনাহের) ব্যাপার। (এ বিবাহ যেমন অবৈধ, অনুরূপভাবে মুখে এর আলোচনা করা অথবা অন্তরে ইচ্ছা করা সব গোনাহ্। অতএব) তোমরা (এ সম্পর্কে) খোলাখুলি কিছু বল অথবা (এরূপ ইচ্ছাকে) অন্তরে গোপন রাখ, আল্লাহ্ (উভয় বিষয় জানেন; কেননা, তিনি) সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ। (সুতরাং তোমাদের তজ্জন্য শাস্তি দেবেন। আমি উপরে যে পর্দার বিধান দিয়েছি, তাতে কেউ কেউ ব্যতিক্রমভুক্তও আছে, যাদের বর্ণনা এই ঃ) নবী-পত্নীগণের জন্য তাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভগ্নিপুত্র, (সমধর্মিণী) নারী এবং দাসীগণের (সামনে) যাওয়ার ব্যাপারে কোন গোনাহ্ নেই (অর্থাৎ তাদের সামনে যাওয়া জায়েয)। আর (হে নবী-পত্নীগণ! এসব বিধান পালনের ব্যাপারে) আল্লাহ্‌কে ভয় কর (কোন বিধান যেন অমান্য করা না হয়)। নিশ্চয় আল্লাহ্ সবকিছু প্রত্যক্ষ করেন (অর্থাৎ তাঁর কাছে কোন বিষয় গোপন নয়। যে বিপরীত করবে, তাকে শাস্তি দেবেন)।

**আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়**

আলোচ্য আয়াতসমূহে ইসলামী সামাজিকতার কতিপয় রীতিনীতি ও বিধান বিবৃত হয়েছে। পূর্বোক্ত আয়াতসমূহের সাথে এর সম্পর্ক এই যে, এসব আয়াতে বর্ণিত রীতিনীতিগুলো প্রথমে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র গৃহে ও তাঁর পত্নীগণের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে, যদিও এগুলো তাঁর ব্যক্তিসত্তার সাথে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত নয় প্রথম বিধান খাওয়ার দাওয়াত ও মেহমানের কতিপয় রীতিনীতি।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَىٰ طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَٰكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ -

এ আয়াতে দাওয়াত ও আপ্যায়ন সম্পর্কিত তিনটি রীতিনীতি বর্ণিত হয়েছে। এগুলো সকল মুসলমানের জন্য ব্যাপকভাবে প্রযোজ্য; কিন্তু যে ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে, তা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র গৃহে সংঘটিত হয়েছিল। তাই শিরোনামে بيوت النبى উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম রীতি এই যে, নবী (সা)-র গৃহে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করো না। বলা হয়েছে ঃ

لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ

দ্বিতীয় রীতি এই যে, প্রবেশের অনুমতি এমন কি, খাওয়ার দাওয়াত হলেও সময়ের পূর্বে উপস্থিত হয়ে আহার্য প্রস্তুতির অপেক্ষায় বসে থেকো না। غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ — نَاظِرِ শব্দের অর্থ এখানে অপেক্ষাকারী এবং إِنَا শব্দের অর্থ খাদ্য রন্ধন করা। আয়াতে لَا تَدْخُلُوا নিষেধাজ্ঞা থেকে দু'টি ব্যতিক্রম প্রকাশ করা হয়েছে—একটি إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ এর إِلَّا শব্দ দ্বারা এবং অপরটি غَيْرَ শব্দ দ্বারা। এর অর্থ এই যে, বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করো না এবং সময়ের পূর্বে এসে খাদ্য রন্ধনের অপেক্ষায় বসে থেকো না; বরং যথাসময়ে আহবান করা হলে গৃহে প্রবেশ কর। বলা হয়েছে ঃ وَلَٰكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا -

তৃতীয় রীতি এই যে, খাওয়া শেষে নিজ নিজ কাজে ছড়িয়ে পড়। পরস্পরে কথাবার্তা বলার জন্য গৃহে অনড় হয়ে বসে থেকো না। বলা হয়েছে ঃ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ

মাস'আলা ঃ এই রীতি সেই ক্ষেত্রে, যেখানে খাওয়ার পর দাওয়াতপ্রাপ্তদের বেশীক্ষণ বসে থাকা দাওয়াতকারীর জন্য কষ্টের কারণ হয়; যেমন সে একাজ সেরে অন্য কাজে মশগুল হতে চায় কিংবা তাদেরকে বিদায় দিয়ে অন্য মেহমানদেরকে খাওয়াতে চায়। উভয় অবস্থায় দাওয়াতপ্রাপ্তদের বসে থাকা তার জন্য কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু যেখানে সাধারণ অবস্থা ও নিয়মদৃষ্টে জানা যায় যে, আহারের পর দাওয়াতপ্রাপ্তদের বেশীক্ষণ বসে থাকা দাওয়াতকারীর জন্য কষ্টের কারণ হবে না, সেখানে এই রীতি প্রযোজ্য নয়। আজকালকার দাওয়াতসমূহে তাই প্রচলিত আছে।

আয়াতেও পরবর্তী বাক্য এর প্রমাণ, যাতে বলা হয়েছেঃ

إِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللّٰهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ

অর্থাৎ আহারের পর কথাবার্তায় মশগুল হতে নিষেধ করার কারণ এই যে, এতে রসূলুল্লাহ্ (সা) কষ্ট অনুভব করতেন। কারণ, মেহমানদের খানাপিনার ব্যবস্থা অন্দরমহলে করা হত। সেখানে মেহমানদের বেশীক্ষণ বসে থাকা যে কষ্টের কারণ, তা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না।

আয়াতে আরো বলা হয়েছে যে, মেহমানদের এই আচরণে যদিও রসূলুল্লাহ্ (সা) কষ্ট পেতেন; কিন্তু নিজ গৃহের মেহমান হওয়ার কারণে তাদেরকে শিষ্টাচার শিক্ষা দিতে সংকোচ বোধ করতেন। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা সত্য প্রকাশে সংকোচ বোধ করেন না।

**মাস'আলাঃ** এই বাক্য থেকে মেহমানদের আদর-আপ্যায়নের যথেষ্ট গুরুত্ব জানা গেল। দাওয়াতের শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়া যদিও রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল; কিন্তু নিজের মেহমান হওয়ার অবস্থায় তিনি তাও মুলতবি রাখেন। ফলে আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ং কোরআনে এই শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করলেন।

**দ্বিতীয় বিধান নারীদের পর্দাঃ** وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْئَلُوهُنَّ مِنْ وَّرَاءِ حِجَابٍ ذٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ এতে শানে-নুযূলের বিশেষ ঘটনার ভিত্তিতে বর্ণনা এবং বিশেষভাবে নবী-পত্নীগণের উল্লেখ থাকলেও এ বিধান সমগ্র উম্মতের জন্য ব্যাপকভাবে প্রযোজ্য। বিধানের সারমর্ম এই যে, নারীদের কাছ থেকে ভিন্ন পুরুষদের কোন ব্যবহারিক বস্তু, পাত্র, বস্ত্র ইত্যাদি নেওয়া জরুরী হলে সামনে এসে নেবে না; বরং পর্দার অন্তরাল থেকে চাইবে। আরও বলা হয়েছে যে, পর্দার এই বিধান পুরুষ ও নারী উভয়ের অন্তরকে মানসিক কুমন্ত্রণা থেকে পবিত্র রাখার উদ্দেশ্যে দেওয়া হয়েছে।

**পর্দার বিশেষ গুরুত্বঃ** এখানে প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, এস্থলে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র পুণ্যাত্মা পত্নীগণকে পর্দার বিধান দেওয়া হয়েছে, যাদের অন্তরকে পাক-সাফ রাখার দায়িত্ব আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ং গ্রহণ করেছেন। পূর্বোল্লিখিত لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ আয়াতে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

অপরদিকে যে সব পুরুষকে সম্বোধন করে এই বিধান দেওয়া হয়েছে, তারা হলেন রসূলে করীম (সা)-এর সাহাবায়ে কিরাম, যাদের মধ্যে অনেকের মর্যাদা ফেরেশতাগণেরও উর্ধ্বে।

কিন্তু এসব বিষয় সত্ত্বেও তাঁদের আন্তরিক পবিত্রতা ও মানসিক কুমন্ত্রণা থেকে বাঁচার জন্য পুরুষ ও নারীর মধ্যে পর্দার ব্যবস্থা করা জরুরী মনে করা হয়েছে। আজ এমন ব্যক্তি কে, যে তার মনকে সাহাবায়ে কিরামের পবিত্র মন অপেক্ষা এবং তার স্ত্রীর মনকে পুণ্যাত্মা নবী-পত্নীগণের মন অপেক্ষা অধিক পবিত্র হওয়ার দাবি করতে পারে। আর এটা মনে করতে পারে যে, নারীদের সাথে তাদের মেলামেশা কোন অনিষ্টের কারণ হবে না।

**আলোচ্য আয়াতসমূহ অবতরণের হেতু ঃ** এসব আয়াতের শানে-নুযূলে কয়েকটি ঘটনা বর্ণনা করা হয়। এগুলোর মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই। ঘটনাবলীর সমষ্টি এ আয়াত অবতরণের হেতু হতে পারে। আয়াতের শুরুতে দাওয়াতের শিষ্টাচার বর্ণিত হয়েছে যে, ডাকা না হলে খাওয়ার জন্য যাবে না এবং খাওয়ার অপেক্ষায় পূর্ব থেকে বসে থাকবে না। ইবনে আবী হাতেমের বর্ণনা অনুযায়ী এর শানে-নুযূল এই যে, এই আয়াত এমন ভারী ও পরভোজী লোকদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা দাওয়াত ছাড়াই কারও গৃহে যেয়ে খাওয়ার অপেক্ষায় বসে থাকে।

ইমাম আবদ ইবনে হোমায়েদ হযরত আনাস থেকে বর্ণনা করেন, এই আয়াত এমন কতিপয় লোকের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে, যারা অপেক্ষায় থাকত এবং খাওয়ার সময় হওয়ার পূর্বে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র গৃহে যেয়ে কথাবার্তায় মশগুল থাকত। অতপর আহার্য প্রস্তুত হয়ে গেলে বিনাদ্বিধায় তাতে শরীক হয়ে যেত। আয়াতের শুরুতে উল্লিখিত নির্দেশ তাদের সম্পর্কে জারি করা হয়েছে। এসব বিধান পর্দার বিধান অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বেকার। তখন সাধারণ পুরুষরা অন্দর মহলে আসা-যাওয়া করত।

পর্দা সম্পর্কিত দ্বিতীয় বিধানের শানে-নুযূল সম্পর্কে ইমাম বুখারী দু'টি রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন। হযরত আনাস (রা)-এর বর্ণিত এক রেওয়ায়েত এই যে, হযরত ওমর (রা) একবার রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে আরয করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ্ (সা)! আপনার কাছে সৎ-অসৎ হরেক রকমের লোক আসা-যাওয়া করে, আপনি পত্নীগণকে পর্দা করার আদেশ দিলে খুবই ভাল হত। এর পরিপ্রেক্ষিতে পর্দার আয়াত নাযিল হয়।

বুখারী ও মুসলিমে হযরত ফারূকে আযম (রা)-এর উক্তি বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ

وافقت ربى فى ثلاث قلت يا رسول الله لو اتخذت فى مقام ابراهيم مصلى فانزل الله تعالى واتخذوا مقام ابراهيم مصلى و قلت يا رسول الله ان نساءك يدخل عليهن البر و الفاجر فلو حجبتهن فانزل الله اية

الحجاب و قلت لا زواج النبى صلى الله عليه و سلم لما تما لا ن عليه فى الغير ة عسى ربه ان طلقكن ان يبد له از و اجا خيرا منكن فنز لت كذلك

"আমি আমার পালনকর্তার সাথে তিনটি বিষয়ে একইরূপ মতে পৌঁছেছি— (১) আমি রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে এই মর্মে বাসনা প্রকাশ করলাম যে, আপনি মকামে ইবরাহীমকে নামাযের জায়গা করে নিলে ভাল হত। এর পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা আদেশ নাযিল করলেন, তোমরা মকামে ইবরাহীমকে নামাযের জায়গা করে নাও। (২) আমি আরয করলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ্ (সা)। আপনার পত্নীগণের সামনে সৎ-অসৎ প্রত্যেক ব্যক্তি আসে। আপনি তাদেরকে পর্দার আদেশ দিলে ভাল হত। এর পরিপ্রেক্ষিতে পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হল। (৩) নবী-পত্নীগণের মধ্যে যখন পারস্পরিক আত্মমর্যাদাবোধ ও ঈর্ষা মাথাচাড়া দিয়ে উঠল, তখন আমি বললাম, যদি রসূলুল্লাহ্ (সা) তোমাদেরকে তালাক দিয়ে দেন, তবে অসম্ভব নয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের অপেক্ষা উত্তম পত্নী তাকে দান করবেন। অতপর ঠিক এই ভাষায়ই কোরআনের আয়াত অবতীর্ণ হয়ে গেল।"

জ্ঞাতব্য ঃ হযরত ফারূকে আযম (রা)-এর কথার শিষ্টাচার লক্ষণীয়। তিনি বাহ্যদৃষ্টিতে একথা বলতে চেয়েছিলেন, আমার প্রতিপালক তিনটি বিষয়ে আমার সাথে একই মতে পৌঁছেছেন।

সহীহ্ বুখারীতে হযরত আনাস (রা) বর্ণিত দ্বিতীয় ঘটনা এই যে, হযরত আনাস (রা) বলেন, পর্দার আয়াতের স্বরূপ সম্পর্কে আমি সর্বাধিক জ্ঞাত। কারণ, আমি ছিলাম এ ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী। হযরত যয়নব বিনতে জাহাশ (রা) বিবাহের পর বধূবেশে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র গৃহে আগমন করেন এবং গৃহে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সাথে উপস্থিত ছিলেন। রসূলুল্লাহ্ (সা) ওলীমার জন্য কিছু খাদ্য প্রস্তুত করান এবং সাহাবায়ে কিরামকে দাওয়াত করেন। খাওয়ার পর কিছু লোক পারস্পরিক কথাবার্তার জন্য সেখানেই অনড় হয়ে বসে রইল। তিরমিযীর রেওয়ায়েতে আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা)-ও সেখানে উপস্থিত ছিলেন এবং যয়নব (রা)-ও বিদ্যমান ছিলেন। তিনি সংকোচবশত প্রাচীরের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসেছিলেন। লোকজনের এভাবে দীর্ঘক্ষণ বসে থাকার কারণে রসূলুল্লাহ্ (সা) কষ্ট অনুভব করছিলেন। তিনি গৃহ থেকে বের হয়ে অন্য পত্নীদের সাথে সাক্ষাৎ ও সালামের জন্য চলে গেলেন। তিনি ফিরে এসে দেখলেন যে, লোকজন পূর্ববৎ বসে রয়েছে। তাঁকে ফিরে আসতে দেখে তাদের সম্বিৎ ফিরে এল এবং স্থান ত্যাগ করে চলে গেল। রসূলুল্লাহ্ (সা) গৃহে প্রবেশ করে অল্পক্ষণ পরেই পুনরায় বের হয়ে এলেন। আমি সেখানেই উপস্থিত ছিলাম। তিনি পর্দার আয়াত— يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا পাঠ করে শোনালেন, যা তখনই অবতীর্ণ হয়েছিল।

এ ঘটনা বর্ণনা করে হযরত আনাস (রা) বলেন, আমি এসব আয়াত অবতরণের সর্বাধিক নিকটতম ব্যক্তি ছিলাম। আমার সামনেই আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়েছিল।--- (তিরমিযী)

পর্দার আয়াতের শানে-নুযূল সম্পর্কে বর্ণিত উপরোক্ত ঘটনাত্রয়ের মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই। তিনটি ঘটনাই একত্রে আয়াতসমূহ অবতরণের কারণ হতে পারে।

**তৃতীয় বিধান রসূলুল্লাহ্ (সা)-র ওফাতের পর কারও সাথে তাঁর পত্নীগণের বিবাহ বৈধ নয়ঃ** وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ -এর পূর্বের বাক্যে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কষ্ট হয়, এমন প্রত্যেক কথা ও কাজ হারাম করা হয়েছিল। অতপর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, তাঁর ওফাতের পর তাঁর পত্নীগণের সাথে কারও বিবাহ হালাল নয়।

উপরে বর্ণিত সব বিধানে রসূলুল্লাহ্ (সা) ও তাঁর পত্নীগণকে সম্বোধন করা হলেও বিধানাবলী সকল উম্মতের জন্যও ব্যাপকভাবে প্রযোজ্য ছিল। কিন্তু এই সর্বশেষ বিধানটি এরূপ নয়। কেননা, সাধারণ উম্মতের জন্য বিধান এই যে, স্বামীর মৃত্যুর পর ইদ্দত অতিবাহিত হলে স্ত্রী অপরকে বিবাহ করতে পারে। কিন্তু নবী-পত্নীগণের জন্য বিশেষ বিধান এই যে, তাঁরা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র ওফাতের পর কাউকে বিবাহ করতে পারবেন না।

এর কারণ এটাও হতে পারে যে, তাঁরা কোরআনের বর্ণনা অনুযায়ী মু'মিনগণের জননী। তবে তাঁদের জননী হওয়ার প্রভাব তাঁদের আত্মিক সন্তানদের উপর এভাবে প্রতিফলিত হয় না যে, তারা পরস্পর ভ্রাতা-ভগিনী হয়ে একে অপরকে বিবাহ করতে পারবে না। বরং বিবাহের অবৈধতা তাঁদের ব্যক্তিসত্তা পর্যন্ত সীমিত রাখা হয়েছে।

এ রূপ বলাও অবান্তর নয় যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর পবিত্র রওজা শরীফে জীবিত আছেন। তাঁর ওফাত কোন জীবিত স্বামীর আড়াল হয়ে যাওয়ার অনুরূপ। এ কারণেই তাঁর ত্যাজ্য সম্পত্তি বন্টন করা হয়নি এবং এর ভিত্তিতেই তাঁর পত্নীগণের অবস্থা অপরাপর বিধবা নারীদের মত হয়নি।

আরও একটি রহস্য এই যে, শরীয়তের নিয়মানুযায়ী জান্নাতে প্রত্যেক নারী তার সর্বশেষ স্বামীর সাথে অবস্থান করবে। হযরত হুযায়ফা (রা) তাঁর পত্নীকে অসিয়ত করেছিলেন, তুমি জান্নাতে আমার স্ত্রী থাকতে চাইলে আমার পর দ্বিতীয় বিবাহ করো না। কেননা জান্নাতে সর্বশেষ স্বামীই তোমাকে পাবে।---(কুরতুবী)

তাই আল্লাহ্ তা'আলা নবী-পত্নীগণকে পয়গম্বরের পত্নী হওয়ার যে গৌরব ও সম্মান দুনিয়াতে দান করেছেন, পরকালে তা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য তাঁদের বিবাহ অপরের সাথে হারাম করে দিয়েছেন।

এছাড়া কোন স্বামী স্বভাবগতভাবে এটা পছন্দ করে না যে, তার স্ত্রীকে অপরে বিবাহ করুক। কিন্তু এই স্বাভাবিক মনোবাসনা পূর্ণ করা সাধারণ মানুষের জন্য শরীয়তের আইনে জরুরী নয়। রসূলুল্লাহ্ (সা)-র এই স্বাভাবিক বাসনার প্রতিও আল্লাহ্ তা'আলা সম্মান প্রদর্শন করেছেন। এটা তাঁর বিশেষ সম্মান।

রসূলুল্লাহ্ (সা)-র ইন্তেকাল পর্যন্ত যেসব পত্নী তাঁর অন্দর মহলে ছিলেন, উপরোক্ত বিধান তাঁদের সকলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এ ব্যাপারে সকল ফিকাহ্‌বিদ একমত। কিন্তু যাঁদেরকে তিনি তালাক দিয়েছিলেন অথবা অন্য কোন কারণে যারা আলাদা হয়ে গিয়েছিল, তাদের সম্পর্কে ফিকাহ্‌বিদগণের বিভিন্ন উক্তি আছে। কুরতুবী এসব উক্তি বিস্তারিত লিপিবদ্ধ করেছেন।

إِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيمًا — অর্থাৎ রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে কোন প্রকার কষ্ট দেওয়া অথবা তাঁর ইন্তিকালের পর তাঁর পত্নীগণকে বিবাহ করা আল্লাহ্ তা'আলার কাছে গুরুতর পাপ।

إِنْ تُبْدُوا شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا — আয়াতের শেষে পুনরাবৃত্তি করে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা অন্তরের গোপন ইচ্ছা ও চিন্তাধারা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত। তোমরা কোন কিছু গোপন কর বা প্রকাশ কর সবই আল্লাহ্‌র সামনে প্রকাশমান। এতে জোর দেওয়া হয়েছে, উল্লিখিত বিধানাবলীর ব্যাপারে যেন কোন প্রকার সন্দেহ, সংশয় ও কুমন্ত্রণাকে অন্তরে স্থান না দেওয়া হয় এবং এগুলোর বিরোধিতা থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টা করা হয়।

আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত বিষয়ত্রয়ের মধ্যে নারীদের পর্দার বিষয়টি কয়েক কারণে বিশদ বর্ণনা সাপেক্ষ। তাই এ সম্পর্কে নিম্নে প্রয়োজনীয় আলোচনা করা হচ্ছে।

**পর্দার বিধানাবলী, অশ্লীলতা দমনে ইসলামী ব্যবস্থা ঃ** অশ্লীলতা, অপকর্ম, ব্যভিচার ও তার প্রাথমিক কার্যাবলীর ধ্বংসাত্মক প্রভাব কেবল ব্যক্তিবর্গকেই নয়; বরং গোত্র, পরিবার এবং মাঝে মাঝে সুবিশাল সাম্রাজ্যকেও ছারখার করে দেয়। অধুনা পৃথিবীতে হত্যা ও লুণ্ঠনের যত সব ঘটনা পরিদৃষ্ট হয়, সঠিকভাবে খোঁজ নিলে দেখা যাবে যে, অধিকাংশ ঘটনার পটভূমিকায় কোন নারী ও যৌন বিকৃতির জাল বিস্তৃত রয়েছে। এ কারণেই পৃথিবীর সৃষ্টিলগ্ন থেকে এ পর্যন্ত সমস্ত জাতি, ধর্ম ও ভূ-খণ্ড এ বিষয়ে একমত যে, এটা একটা মারাত্মক দোষ ও অনিষ্ট।

দুনিয়ার এই শেষ যুগে ইউরোপীয়ান জাতিসমূহ তাদের ধর্মীয় সীমানা এবং প্রাচীন ও শক্তিশালী ঐতিহ্য ভেঙ্গে দিয়ে ব্যভিচারকে সত্তাগতভাবে কোন অপরাধই স্বীকার করে না। তারা সভ্যতা ও সমাজ জীবনকে এমনভাবে গড়ে নিয়েছে, যাতে প্রতি পদক্ষেপে যৌনবিকৃতি ও অশ্লীলতার প্রকাশ্য আবেদন বিদ্যমান আছে। কিন্তু

এর কুফল ও অশুভ পরিণতিকে তারাও অপরাধের তালিকা থেকে বাদ দিতে পারেনি। ফলে বেশ্যাবৃত্তি, বলপূর্বক ধর্ষণ এবং জনসমক্ষে অশালীন কর্মকাণ্ডকে দণ্ডনীয় অপরাধ সাব্যস্ত করতে হয়েছে। এর উদাহরণ এ ছাড়া কিছুই নয় যে, একব্যক্তি অগ্নি সংযোগ করার জন্য খড়ি স্তূপীকৃত করল, অতপর তাতে কেরোসিন ছিটিয়ে দিয়ে অগ্নি সংযোগ করল। এর লেলিহান শিখা যখন উপরে উত্থিত হতে লাগল, তখন এর উপর বিধি-নিষেধ আরোপ করতে ও একে নিবৃত্ত করতে তৎপর হয়ে উঠল।

এর বিপরীতে ইসলাম যে সব বিষয়কে দোষ এবং মানবতার জন্য ক্ষতিকর সাব্যস্ত করে শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য করেছে, সেগুলোর প্রাথমিক কার্যাবলীর উপরও বিধি-নিষেধ আরোপ করেছে এবং সেগুলোকে নিষিদ্ধ করেছেন। এ ব্যাপারে ব্যভিচার ও অপকর্ম থেকে রক্ষা করাই আসল উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু একে দৃষ্টি নত রাখার আইন দ্বারা শুরু করেছে। নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা নিষিদ্ধ করেছে। নারীদেরকে গৃহাভ্যন্তরে থাকার আদেশ দিয়েছে। প্রয়োজনে বাইরে যাওয়ার সময়ও বোরকা অথবা লম্বা চাদর দ্বারা দেহ আবৃত করে বের হওয়ার এবং সড়কের কিনারা ধরে চলার নির্দেশ দিয়েছে। সুগন্ধি লাগিয়ে অথবা শব্দ হয় এমন অলংকার পরিধান করে বের হতে নিষেধ করেছে। অতপর যে ব্যক্তি এসব সীমানা ও বাধা ডিঙ্গিয়ে বের হয়ে পড়ে, তার জন্য এমন কঠোর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করেছে, যা একবার কোন পাপিষ্ঠের উপর প্রয়োগ করা হলে সমগ্র জনগোষ্ঠীর জন্য সবক হয়ে যায়।

ইউরোপীয়ানরা এবং তাদের অনুসারীরা অশ্লীলতার বৈধতা সপ্রমাণ করার জন্য নারীদের পর্দাকে তাঁদের স্বাস্থ্যহানি ও অর্থনৈতিক ক্ষতির কারণরূপে অভিহিত করে। তারা বেপর্দা থাকার উপকারিতা নিয়ে নানা কূটতর্কের অবতারণা করেছে। তাদের বিস্তারিত জওয়াব আলিমগণ বড় বড় পুস্তকে লিপিবদ্ধ করেছেন। এ সম্পর্কে এখানে এতটুকু বুঝে নেওয়াও যথেষ্ট যে, উপকারিতা ও ফায়দা থেকে তো কোন অপরাধ ও পাপ কর্মই মুক্ত নয়। চুরি, ডাকাতি, প্রতারণা এক দিক দিয়ে খুবই লাভ-জনক কারবার। কিন্তু যখন এর মারাত্মক ফলাফল ও পরিণতির ধ্বংসকারিতা সামনে আসে, তখন কোন ব্যক্তি এগুলোকে লাভজনক কারবার বলার ধৃষ্টতা দেখায় না। বেপর্দা থাকার মধ্যে কিছু অর্থনৈতিক উপকারিতা থাকলেও যখন এটা সমগ্র দেশ ও জাতিকে হাজারো বিপর্যয়ের সম্মুখীন করে দেয়, তখন একে উপকারী বলা কোন জ্ঞানী লোকের কাজ হতে পারে না।

**অপরাধ দমনের জন্য ইসলামে উৎসমুখ বন্ধ করার সুবর্ণনীতি এবং এতে সমতা বিধান ঃ** তওহীদ, রিসালত ও পরকাল ইত্যাদি মৌলিক বিশ্বাস যেমন সকল পয়গম্বরের শরীয়তে অভিন্ন ও সর্বসম্মত ছিল, তেমনি সাধারণ পাপকর্ম, অশ্লীলতা ও গর্হিত কার্যাবলী প্রত্যেক শরীয়তে ও ধর্মে হারাম করা হয়েছিল। কিন্তু পূর্ববর্তী শরীয়তসমূহে এগুলোর কারণ ও উপায় উপকরণাদিকে সর্বাবস্থায় হারাম করা হয়নি। যে পর্যন্ত এগুলোর মাধ্যমে কোন অপরাধ বাস্তবরূপ লাভ না করত, সেই পর্যন্ত এগুলো হারাম ছিল না।

কিন্তু শরীয়তে মুহাম্মদী হচ্ছে কিয়ামত পর্যন্ত কার্যকরী শরীয়ত। তাই আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এর হিফাযতের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা এই নেওয়া হয়েছে যে, অপরাধ ও পাপকর্ম তো হারাম আছেই; সেসব কারণ ও উপায়-উপকরণাদিকেও হারাম করে দেওয়া হয়েছে, যেগুলো স্বভাবসিদ্ধভাবে মানুষকে এসব অপরাধের দিকে পৌঁছিয়ে দেয়। উদাহরণত মদ্যপান হারাম করার সাথে সাথে মদ তৈরী করা, ক্রয়-বিক্রয় করা এবং কাউকে দেওয়াও হারাম করা হয়েছে। সুদ হারাম করার জন্য সুদের সাথে সামঞ্জস্যশীল লেনদেনও হারাম করা হয়েছে। এ কারণে ফিকাহ্‌বিদগণ অনুমোদিত কাজ-কারবার থেকে অর্জিত মুনাফাকেও সুদের ন্যায় অপকৃষ্ট সম্পদ আখ্যা দিয়েছেন। শিরক ও প্রতিমা পূজাকে কোরআন মহা অন্যায় ও ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ সাব্যস্ত করার সাথে সাথে এর কারণ ও উপকরণাদির উপরও কড়া বিধিনিষেধ আরোপ করেছে। সূর্যের উদয়, অস্ত ও মধ্যগগনে থাকার সময় মুশরিকরা সূর্যের পূজা করত। এসব সময়ে নামায পড়া হলেও সূর্যপূজারীদের সাথে এক প্রকার সাদৃশ্য হয়ে যেত। অতপর এই সাদৃশ্য কোন সময় নামাযী ব্যক্তির শিরকে লিপ্ত হওয়ার কারণ হতে পারত। তাই শরীয়ত এসব সময়ে নামায ও সিজদা হারাম ও নাজায়েয করে দিয়েছে। প্রতিমা, মূর্তি ও চিত্র মূর্তিপূজার নিকটবর্তী উপায়। তাই মূর্তি নির্মাণ ও চিত্র তৈরী হারাম এবং এগুলোর ব্যবহার নাজায়েয করে দেওয়া হয়েছে।

অনুরূপভাবে শরীয়ত ব্যভিচারকে হারাম করার সাথে সাথে তার সমস্ত নিকটবর্তী কারণ ও উপায়কেও হারামের তালিকাভুক্ত করে দিয়েছে। কোন বেগানা নারী অথবা শ্মশ্রুবিহীন কিশোর বালকের প্রতি কাম দৃষ্টিতে দেখাকে চোখের যিনা, তার কথা শুনাকে কানের যিনা, তাকে স্পর্শ করাকে হাতের যিনা এবং তার উদ্দেশ্যে পথ চলাকে পায়ের যিনা সাব্যস্ত করেছে। সহীহ্ হাদীসে তদ্রূপই বলা হয়েছে। এহেন অপরাধ থেকে রক্ষা করার জন্য নারীদের পর্দার বিধানাবলী অবতীর্ণ হয়েছে।

কিন্তু নিকটবর্তী ও দূরবর্তী কারণ ও উপকরণাদির এক দীর্ঘ পরম্পরা রয়েছে। অধিক দূর পর্যন্ত এই পরম্পরাকে নিষিদ্ধ করা হলে মানুষের জীবন দুর্বিষহ হয়ে পড়বে এবং কাজকর্মে খুব অসুবিধা দেখা দেবে। এটা এই শরীয়তের মেযাজের বিপরীত। এ সম্পর্কে কোরআন পাকের খোলাখুলি নির্দেশ এই যে, مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ অর্থাৎ ধর্মের কাজে তোমাদের প্রতি কোন সংকীর্ণতা আরোপ করা হয়নি। তাই কারণ ও উপকরণাদির ক্ষেত্রে বিজ্ঞজনোচিত ফয়সালা এই যে, যে সব কাজকর্ম করলে মানুষ সাধারণ অভ্যাসের দিক দিয়ে অবশ্যই পাপকর্মে লিপ্ত হয়ে পড়ে, শরীয়ত সেসব নিকটবর্তী কারণকে আসল পাপকর্মের সাথে সংযুক্ত করে হারাম করে দিয়েছে। পক্ষান্তরে যেসব দূরবর্তী কারণ কার্যে পরিণত করলে মানুষের পাপকার্যে লিপ্ত হওয়া স্বভাবত অপরিহার্য ও জরুরী হয় না, কিন্তু পাপ কাজে সেগুলোর কিছু না কিছু দখল আছে, শরীয়ত এ ধরনের কারণ ও উপকরণাদিকে মকরূহ ও গর্হিত

সাব্যস্ত করেছে। আর যেসব কারণ আরও দূরবর্তী এবং পাপকর্মে যেগুলোর প্রভাব বিরল, শরীয়ত সেগুলোকে উপেক্ষা করেছে এবং মোবাহ্ তথা অনুমোদিত বিষয়াদির অন্তর্ভুক্ত করে দিয়েছে।

প্রথমোক্ত কারণের উদাহরণ মদ্য বিক্রয়। এটা মদ্যপানের নিকটবর্তী কারণ। ফলে শরীয়ত একেও মদ্যপানের অনুরূপ হারাম সাব্যস্ত করেছে। কোন বেগানা নারীকে কামভাব সহকারে স্পর্শ করা সাক্ষাৎ যিনা না হলেও যিনার নিকটবর্তী কারণ। তাই শরীয়ত একে যিনার ন্যায় হারাম করেছে।

দ্বিতীয় কারণের উদাহরণ এমন ব্যক্তির কাছে আঙ্গুর বিক্রয় করা, যার সম্পর্কে জানা আছে যে, সে আঙ্গুর দ্বারা মদ তৈরী করে এবং এটাই তার পেশা। অথবা সে পরিষ্কার বলে দিয়েছে যে, এই আঙ্গুর দ্বারা মদ তৈরী করা হবে। এটা মদ্য বিক্রয়ের অনুরূপ হারাম না হলে মকরূহ ও গর্হিত কাজ। সিনেমাগৃহ নির্মাণ অথবা সুদের ব্যাংক পরিচালনার জন্য জমি ও গৃহ ভাড়া দেওয়ার বিধানও তাই। লেনদেনের সময় যদি জানা যায় যে, গৃহটি নাজায়েয কাজের জন্য ভাড়া নেওয়া হচ্ছে, তবে এই ভাড়া দেওয়া মকরূহ তাহরীমী ও নাজায়েয।

তৃতীয় কারণের উদাহরণ সাধারণ ক্রেতাদের কাছে আঙ্গুর বিক্রয় করা। এক্ষেত্রে এটাও সম্ভবপর যে, কেউ এ আঙ্গুর দ্বারা মদ তৈরী করবে। কিন্তু সে তা প্রকাশ করেনি এবং বিক্রেতাও তা জানে না। শরীয়তের আইনে এ ধরনের ক্রয়-বিক্রয় মোবাহ্ ও বৈধ।

এখানে স্মরণ রাখা জরুরী যে, শরীয়ত যেসব কাজকে পাপকর্মের নিকটবর্তী কারণ (প্রথম শ্রেণীর কারণ) সাব্যস্ত করে হারাম করেছে, অতপর সেগুলো সকলের জন্য সর্বাবস্থায় হারাম। পাপকর্মের কারণ বাস্তবে হোক বা না হোক। এখন তা শরীয়তের এমন স্বতন্ত্র বিধান, যার বিরুদ্ধাচরণ হারাম।

এই ভূমিকার পর এখন বুঝুন, নারীদের পর্দাও এই উপকরণাদি বন্ধ করার নীতির উপর ভিত্তিশীল। কারণ, পর্দা না করা পাপকর্মে লিপ্ত হওয়ার কারণ ও উপায়। এতেও কারণাদির পূর্ববর্ণিত প্রকারসমূহের বিধানাবলী প্রযোজ্য হবে। উদাহরণত কোন যুবক পুরুষের সামনে যুবতী নারীর দেহ অনাবৃত রাখা পাপকর্মে লিপ্ত হওয়ার নিকটবর্তী কারণ। অধিকাংশ অভ্যাসের দিকে লক্ষ্য করলে এতে পাপকর্ম সংঘটিত হয়ে যাওয়া অপরিহার্যের মতই। তাই শরীয়তের আইনে এটা যিনার অনুরূপ হারাম। কারণ, শরীয়ত এ কাজকে অশ্লীল সাব্যস্ত করেছে। ফলে এখন তা সর্বাবস্থায় হারাম, যদিও তা কোন নিষ্পাপ ব্যক্তির সাথে হয় অথবা এমন ব্যক্তির সাথে, যে আত্ম-সংযমের মাধ্যমে পাপকর্ম থেকে বেঁচে থাকবে। চিকিৎসা ইত্যাদি প্রয়োজনের কারণে অঙ্গ খোলার বৈধতা আলাদা বিষয়। এর কারণে মূল অবৈধতার উপর কোন বিরূপ

প্রতিক্রিয়া হয় না। এ বিষয়টি সময় ও পরিস্থিতি দ্বারাও প্রভাবান্বিত হয় না। ইসলামের প্রাথমিক যুগেও এর বিধান তাই ছিল, যা আজ পাপাচার ও অনাচারের যুগে রয়েছে।

পর্দা বর্জনের দ্বিতীয় স্তর হচ্ছে গৃহের চতুঃপ্রাচীরের বাইরে বোরকা অথবা লম্বা চাদর দ্বারা সমগ্র দেহ আবৃত করে বের হওয়া। এটা পাপ কর্মের দূরবর্তী কারণ, এর বিধান এই যে, এরূপ করা বাস্তবে অনর্থের কারণ হলে নাজায়েয এবং যে ক্ষেত্রে অনর্থের ভয় নেই; সেখানে জায়েয। এ কারণেই এর বিধান সময় ও পরিস্থিতির পরিবর্তনে পরিবর্তিত হতে পারে। রসূলুল্লাহ্ (সা)-র যুগে নারীদের এভাবে বের হওয়া কোন অনর্থের কারণ ছিল না। তাই তিনি নারীদেরকে বোরকা ইত্যাদিতে আবৃত হয়ে মসজিদে আসার কতিপয় শর্ত সহকারে অনুমতি দিয়েছিলেন এবং তাদেরকে মসজিদে আগমনে বাধা দিতে নিষেধ করেছিলেন। তবে সে যুগেও নারীদেরকে গৃহে নামায পড়ার জন্য তিনি উৎসাহিত করতেন। কারণ, মসজিদে আসা অপেক্ষা গৃহে নামায পড়া তাদের জন্য অধিক সওয়াবের কাজ। অনর্থের ভয় না থাকার কারণে তখন তাদেরকে মসজিদে আসতে নিষেধ করা হত না। রসূলুল্লাহ্ (সা)-র ওফাতের পর সাহাবায়ে কিরাম লক্ষ্য করলেন যে, এখন নারীদের মসজিদে আগমন অনর্থমুক্ত নয়; যদিও তারা বোরকা, চাদর ইত্যাদি পরিধান করে আসে। ফলে তারা সর্বসম্মতিক্রমে নারীদেরকে মসজিদের জামা'আতে আগমন করতে নিষেধ করেছেন। হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ্ (সা) বর্তমান পরিস্থিতি দেখলে নারীদের অবশ্যই মসজিদে আসতে বারণ করতেন। এ থেকে জানা গেল যে, সাহাবায়ে কিরামের ফয়সালা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র ফয়সালা থেকে ভিন্নতর নয়; বরং তিনি যে সব শর্তের অধীনে অনুমতি দিয়েছিলেন, সেগুলোর অনুপস্থিতির কারণেই বিধান পাল্টে গেছে।

কোরআন পাকের সাতটি আয়াতে নারীদের পর্দার বিষয় বর্ণিত হয়েছে। তিনটি আয়াত সূরা নূরে পূর্বেই বিবৃত হয়েছে। আলোচ্য সূরা আহযাবের চারটি আয়াতের মধ্যে একটি আগে উল্লিখিত হয়েছে, একটি আলোচনাধীন আছে এবং অবশিষ্ট দু'টি আয়াত পরে আসবে। এসব আয়াতে পর্দার স্তর নির্ধারণ. বিধি-বিধানের পূর্ণ বিবরণ এবং ব্যতিক্রম সমূহের বিশদ বর্ণনা রয়েছে। এমনিভাবে পর্দা সম্বন্ধে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র উক্তি ও কর্ম সম্বলিত সত্তরটিরও অধিক হাদীস বর্ণিত আছে।

**পর্দার হুকুম প্রসঙ্গ ঃ** নারী ও পুরুষের অবাধ মেলামেশা পৃথিবীর সমগ্র ইতিহাসে হযরত আদম (আ) থেকে শুরু করে শেষ নবী (সা) পর্যন্ত কোন যুগেই বৈধ মনে করা হয়নি। কেবল শরীয়ত অনুসারীরাই নয় পৃথিবীর সাধারণ অভিজাত পরিবারসমূহেও এ ধরনের মেলামেশার সুযোগ দেওয়া হয় না।

হযরত মূসা (আ)-র কাহিনীতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাঁর মাদইয়ান সফরের সময় দু'জন যুবতী তাদের ছাগপালকে পানি পান করানোর জন্য দূরে দাঁড়িয়ে ছিল। এর কারণ এটাই বলা হয়েছে যে, তারা পুরুষদের ভিড়ে প্রবেশ করা পছন্দ করেনি এবং সকলের পর অবশিষ্ট পানি পান করাতেই সম্মত হয়েছে। হযরত যয়নব

বিন্‌তে জাহ্‌শের বিবাহের সময় পর্দার প্রথম আয়াত নাযিল হয়েছিল। আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্বেও তিরমিযীর রেওয়ায়েতে তাঁর গৃহে বসার অবস্থা সম্পর্কে বলা হয়েছে وهى مولية وجهها الى الحائط অর্থাৎ তিনি প্রাচীরের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসেছিলেন।

এ থেকে জানা গেল যে, পর্দার হুকুম অবতরণের পূর্বেও নারীপুরুষের অবাধ মেলামেশা এবং যত্রতত্র সাক্ষাৎ ও কথাবার্তার প্রচলন অভিজাত ও সাধু লোকদের মধ্যে কোথাও ছিল না। কোরআন পাকে যে মূর্খতা যুগ (জাহিলিয়াতে উলা) এবং তাতে নারীদের খোলামেলা চলাফেরা (তাবাররুজ) বর্ণিত আছে, তা-ও আরবের অভিজাত পরিবারসমূহে নয়; বরং দাসী ও যাযাবর ধরনের নারীদের মধ্যে ছিল। আরবের সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোকেরা একে দূষণীয় মনে করত। আরবের ইতিহাসই এর সাক্ষী। ভারতবর্ষে হিন্দু, বৌদ্ধ ও অন্যান্য মুশরিক ধর্মাবলম্বীর মধ্যেও নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা পছন্দনীয় ছিল না। পুরুষদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করার দাবি, বাজার ও সড়কে প্যারেড করা, শিক্ষাক্ষেত্র থেকে শুরু করে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের দ্বিধাহীন মেলামেশা এবং নিমন্ত্রণে ঐ ক্লাবসমূহে দেখাসাক্ষাতের বর্তমান কার্যধারা কেবল ইউরোপীয় জাতিসমূহের বেহায়াপনা ও অশ্লীলতার ফসল। এতে এসব জাতিও তাদের অতীত ঐতিহ্যকে বিসর্জন দিয়ে জড়িয়ে পড়েছে। প্রাচীনকালে তাদের মধ্যেও এরূপ অবস্থা ছিল না। আল্লাহ্ তা'আলা নারীর দৈহিক গঠন প্রকৃতিকে যেমন পুরুষ থেকে স্বতন্ত্র করে সৃষ্টি করেছেন, তেমনি তার মন-মস্তিষ্কে স্বভাবগত লজ্জাও নিহিত রেখেছেন, যা তাকে স্বভাবগতভাবে পুরুষ থেকে আলাদা থাকতে এবং আবৃত হয়ে চলতে বাধ্য করে। এই স্বভাবসিদ্ধ ও মজ্জাগত লজ্জা-শরম সৃষ্টির শুরু থেকে নারী ও পুরুষের মধ্যে শালীনতার প্রাচীর হয়ে বিদ্যমান রয়েছে। ইসলামের প্রাথমিক যুগেও এই প্রকার পর্দাই প্রচলিত ছিল।

নারীদের স্থান গৃহের চতুঃপ্রাচীর এবং কোন শরীয়তসম্মত কারণে বাইরে গেলে সম্পূর্ণ দেহ আবৃত করে বাইরে যেতে হবে—নারীদের এই বিশেষ প্রকারের পর্দা হিজরতের পর পঞ্চম হিজরীতে প্রবর্তিত হয়েছে।

এর বিবরণ এই যে, আলিমগণের ঐকমত্যে পর্দা সম্পর্কে প্রথম আয়াত হচ্ছে لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ যা উপরে উল্লিখিত হয়েছে। এ আয়াত হযরত যয়নব বিন্‌তে জাহ্‌শের বিবাহ ও তার পতিগৃহে আগমনের সময় অবতীর্ণ হয়েছে। এই বিবাহের তারিখ সম্পর্কে হাফেজ ইবনে হাজার 'এসাবা' গ্রন্থে এবং ইবনে আবদুল বার 'এস্তিয়াব' গ্রন্থে তৃতীয় হিজরী অথবা পঞ্চম হিজরী উভয় প্রকার উক্তি বর্ণনা করেছেন। ইবনে কাসীরের মতে পঞ্চম হিজরীর উক্তি অগ্রগণ্য। ইবনে সা'দ হযরত আনাস (রা) থেকেও পঞ্চম হিজরী বর্ণনা করেছেন এবং হযরত আয়েশা (রা)-র কতক রেওয়ায়েত থেকেও তাই জানা যায়।

এ আয়াতে নারীদেরকে পর্দার অন্তরালে থাকার আদেশ দেওয়া হয়েছে এবং পুরুষকে বলা হয়েছে যে, তারা নারীদের কাছে কোন কিছু চাইলে পর্দার অন্তরাল থেকে চাইবে। এতে পর্দার গুরুত্ব জানা যায় যে, বিনা প্রয়োজনে পুরুষ ও নারী আলাদাই থাকবে এবং প্রয়োজনে পর্দার অন্তরাল থেকে কথা বলতে হবে।

কোরআন পাকে পর্দার বিবরণ সম্বলিত সাতটি আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে---চারটি সূরা আহযাবে এবং তিনটি পূর্বে বর্ণিত সূরা নূরে। এ ব্যাপারে সকলেই একমত যে, لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ আয়াতটিই পর্দা সম্পর্কিত সর্বপ্রথম আয়াত। সূরা নূরের তিন আয়াত এবং সূরা আহযাবে وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ আয়াত যদিও কোরআনের ক্রমিকে প্রথমে; কিন্তু অবতরণের দিক দিয়ে পশ্চাতে। সূরা আহযাবের প্রথম আয়াতে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, এই আদেশ তখন দেওয়া হয়েছিল, যখন নবী-পত্নীগণকে দুনিয়ার ধনৈশ্বর্য অথবা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সংসর্গ---এ দু'য়ের যে কোন একটি বেছে নেওয়ার ইখতিয়ার দেওয়া হয়েছিল।

এ ঘটনায় আরও উল্লেখ আছে যে, যাদেরকে এই ইখতিয়ার দেওয়া হয়েছিল, তাদের মধ্যে হযরত যয়নব বিন্‌তে জাহ্‌শও ছিলেন। এ থেকে বোঝা গেল যে, তাঁর বিবাহ এই আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্বেই হয়েছিল। এমনিভাবে সূরা নূরের আয়াত-সমূহও এরপর অপবাদ রটনার ঘটনা সম্পর্কে নাযিল হয়েছিল, যা বনি মুস্তালিক অথবা মুরাইসী যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে সংঘটিত হয়েছিল। এ যুদ্ধ ষষ্ঠ হিজরীতে সংঘটিত হয়। অপর দিকে পর্দার বিধান হযরত যয়নব (রা)-এর বিবাহে আয়াত নাযিল হওয়ার সাথে সাথে কার্যকর হয়।

**গুপ্তাঙ্গ আবৃত করার বিধান ও পর্দার মধ্যে পার্থক্য ঃ** পুরুষ ও নারীদেহের সেই অংশ যাকে আরবীতে 'আওরাত' এবং উর্দুতে 'সতর' বলা হয়, তা সকলের কাছে গোপন করা শরীয়তগত, স্বভাবগত ও যুক্তিগতভাবে ফরয। ঈমানের পর সর্ব প্রথম করণীয় ফরয হচ্ছে এই গুপ্তাঙ্গ আবৃত করা। সৃষ্টির শুরু থেকেই এটা ফরয এবং সকল পয়গম্বরের শরীয়তে তা ফরয ছিল, বরং শরীয়তসমূহের অস্তিত্বের পূর্বেও জান্নাতে যখন নিষিদ্ধ বৃক্ষ ভক্ষণের কারণে হযরত আদম (আ)-এর জান্নাতী পোশাক খুলে যাওয়ায় গুপ্তাঙ্গ প্রকাশ হয়ে পড়ল, তখন সেখানেও আদম (আ) গুপ্তাঙ্গ খোলা রাখা বৈধ মনে করেন নি। তাই আদম ও হাওয়া উভয়ে জান্নাতের পাতা গুপ্তাঙ্গের উপর বেঁধে নেন। وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ আয়াতের অর্থও তাই। দুনিয়াতে আগমনের পর আদম (আ) থেকে শুরু করে শেষ নবী (সা) পর্যন্ত প্রত্যেক পয়গম্বরের শরীয়তে গুপ্তাঙ্গ আবৃত করা ফরয রয়েছে। গুপ্তাঙ্গ

নির্দিষ্টকরণে মতভেদ হতে পারে ; কিন্তু আসল ফরয সকল শরীয়তে স্বীকৃত ছিল। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রত্যেক মানুষের উপর এটা ফরয, কেউ দেখুক অথবা না দেখুক। এ কারণে প্রয়োজনীয় বস্ত্র থাকা সত্ত্বেও যদি কেউ অন্ধকার রাত্রিতে উলঙ্গ হয়ে নামায পড়ে, তবে এ নামায সর্বসম্মতিক্রমে নাজায়েয ; অথচ তাকে কেউ উলঙ্গ অবস্থায় দেখে না। (বাহরুর রায়েক) অনুরূপভাবে কেউ দেখে না, এরূপ নির্জন জায়গায় নামায পড়লে যদি গুপ্তাঙ্গ খুলে যায়, তবে নামায ফাসেদ হয়ে যাবে।

নামাযের বাইরে মানুষের সামনে গুপ্তাঙ্গ আবৃত করা যে ফরয, এ ব্যাপারে কারও দ্বিমত নেই ; কিন্তু নির্জনতায়ও শরীয়ত সিদ্ধ অথবা স্বভাবসিদ্ধ প্রয়োজন ব্যতিরেকে গুপ্তাঙ্গ খুলে বসা জায়েয নয়। এটাই বিশুদ্ধ উক্তি।---(বাহ্‌র)

এ হচ্ছে গুপ্তাঙ্গ আবৃত করার বিধান, যা ইসলামের শুরু থেকে বরং সৃষ্টির প্রথম লগ্ন থেকে ফরয এবং এতে নারী-পুরুষ উভয়ই সমান। প্রকাশ্য ও নির্জনতায়ও সমান ফরয।

কিন্তু পর্দা এই যে, নারীরা বেগানা পুরুষের দৃষ্টির আড়ালে থাকবে। এ ব্যাপারেও এতটুকু বিষয় সকল পয়গম্বর, সজ্জন ও অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে সমভাবে স্বীকৃত ছিল যে, বেগানা পুরুষদের সাথে নারীদের অবাধ মেলামেশা হতে পারে না। কোরআনে উল্লিখিত হযরত শোয়াইব (আ)-এর কন্যাদ্বয়ের উপরে বর্ণিত ঘটনা থেকে জানা যায় যে, সে যুগে এবং তাঁর শরীয়তেও নারী-পুরুষের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলা এবং অবাধ মেলামেশা পছন্দনীয় ছিল না। পুরুষদের সাথে মেলামেশা জরুরী হয়, এমন কোন কাজই নারীদেরকে সোপর্দ করা হত না। মোট কথা, এ থেকে জানা যায় যে, নারীদেরকে নিয়মিত পর্দায় থাকার আদেশ সে যুগে ছিল না। অনুরূপভাবে ইসলামের প্রাথমিক যুগেও এরূপ আদেশ ছিল না। তৃতীয় অথবা পঞ্চম হিজরীতে নারীদের উপর এই পর্দা ফরয করা হয়েছে।

এ থেকে জানা গেল যে, গুপ্তাঙ্গ আবৃত করা এবং পর্দা করা দু'টি আলাদা আলাদা বিষয়। গুপ্তাঙ্গ আবৃত করা চিরন্তন ফরয এবং পর্দা পঞ্চম হিজরীতে ফরয হয়েছে। গুপ্তাঙ্গ আবৃত করা নারী-পুরুষ উভয়ের উপর ফরয এবং পর্দা কেবল নারীদের উপর ফরয। গুপ্তাঙ্গ আবৃত করা প্রকাশ্যে ও নির্জনে সর্বাবস্থায় ফরয এবং পর্দা কেবল বেগানা পুরুষদের উপস্থিতিতে ফরয। এই বিবরণ লিপিবদ্ধ করার কারণ এই যে, উভয় বিষয়কে মিশ্রিত করে দেওয়ার কারণে কোরআনের বিধানাবলী বোঝার ক্ষেত্রে অনেক সন্দেহ দেখা দেয়। উদাহরণত নারীর মুখমণ্ডল ও হাতের তালু সকলের মতেই গুপ্তাঙ্গ বহির্ভূত। তাই নামাযে এগুলো খোলা থাকলে নামায সকলের মতেই জায়েয। এ দু'টি অঙ্গ কোরআন হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ীই ব্যতিক্রমভুক্ত। ফিকাহ্‌বিদগণ কিয়াসের মাধ্যমে পদযুগলকেও এগুলোর অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

কিন্তু বেগানা পুরুষের কাছে পর্দার ক্ষেত্রেও মুখমণ্ডল এবং হাতের তালু ব্যতিক্রমভুক্ত কি না, এ ব্যাপারে মতভেদ আছে। সূরা নূরের لَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا আয়াতে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

**শরীয়তসম্মত পর্দার স্তর ও বিধানাবলীর বিবরণ ঃ** পর্দা সম্পর্কে কোরআন পাকের সাতটি আয়াত ও সত্তরটি হাদীসের সারকথা এই যে, শরীয়তের আসল কাম্য ব্যক্তি-পর্দা অর্থাৎ নারী সত্তা ও তাদের গতিবিধি পুরুষের দৃষ্টি থেকে গোপন থাকা। এটা গৃহের চতুঃপ্রাচীর অথবা তাঁবু ও ঝুলন্ত পর্দার মাধ্যমে হতে পারে। এছাড়া পর্দার যত প্রকার বর্ণিত রয়েছে, সবগুলো প্রয়োজনের ভিত্তিতে এবং প্রয়োজনের সময় ও পরিমাণের সাথে শর্তযুক্ত।

এভাবে ব্যক্তি-পর্দা হচ্ছে পর্দার প্রথম স্তর; যা শরীয়তের আসল কাম্য এবং যার অর্থ নারীদের গৃহে অবস্থান করা। কিন্তু ইসলামী শরীয়ত একটি সর্বাঙ্গীন ও পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা বিধান এতে মানব প্রয়োজনের সকল দিকই বিবেচিত হয়েছে। বলাবাহুল্য, নারীদের গৃহ থেকে বের হওয়ার প্রয়োজন দেখা দেওয়া অবশ্যম্ভাবী। এর জন্য পর্দার দ্বিতীয় স্তর কোরআন ও সুন্নাহ্‌র দৃষ্টে এরূপ মনে হয় যে, নারীরা আপাদমস্তক বোরকা অথবা লম্বা চাদরে আবৃত করে বের হবে। পথ দেখার জন্য চাদরের ভিতর থেকে একটি চক্ষু খোলা রাখবে অথবা বোরকায় চোখের সামনে জালি ব্যবহার করবে। প্রয়োজনের ক্ষেত্রে পর্দার এই দ্বিতীয় স্তরের ব্যাপারেও আলিম ও ফিকাহ্‌বিদগণ একমত।

কতক রেওয়ায়েত থেকে পর্দার তৃতীয় একটি স্তরও জানা যায়, যাতে সাহাবী, তাবেয়ী ও ফিকাহ্‌বিদগণ বিভিন্ন মত পোষণ করেন। তা এই যে, নারীরা যখন প্রয়োজনে গৃহ থেকে বের হবে, তখন মুখমণ্ডল এবং হাতের তালুও মানুষের সামনে খুলতে পারবে যদি দেহ আবৃত থাকে। পর্দার এই স্তরত্রয়ের বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হল ঃ

**প্রথম স্তর গৃহের মাধ্যমে ব্যক্তি-পর্দা ঃ** কোরআন ও সুন্নাহর দৃষ্টিতে এ স্তরই আসল কাম্য। সূরা আহযাবের আলোচ্য وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ আয়াত এর উজ্জ্বল প্রমাণ। আরও উজ্জ্বল প্রমাণ হচ্ছে এ সূরারই শুরুর আয়াত। وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ এসব আয়াতের নির্দেশ রসূলুল্লাহ্ (সা) যেভাবে বাস্তবায়িত করেছেন, তাতে বিষয়টি আরও স্পষ্টরূপে সামনে এসে যায়।

উপরে বলা হয়েছে যে, পর্দা সম্পর্কে প্রথম আয়াত হযরত যয়নব (রা)-এর বিবাহের সময় অবতীর্ণ হয়েছে। হযরত আনাস (রা) বলেন, আমি তখন রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে উপস্থিত ছিলাম। ফলে পর্দার এই ঘটনা আমি সর্বাধিক জ্ঞাত আছি। আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর রসূলুল্লাহ্ (সা) পুরুষদের সামনে একটি চাদর টাঙ্গিয়ে হযরত যয়নব (রা)-কে তার ভেতরে আবৃত করে দেন---বোরকা অথবা চাদরে আবৃত করেন নি। শানে নুযূলের ঘটনায় হযরত উমর (রা)-এর যে উক্তি উপরে বর্ণিত হয়েছে, তা থেকেও জানা যায় যে, তাঁর উদ্দেশ্য ছিল নবী-পত্নীগণ পুরুষদের দৃষ্টি থেকে দূরে অন্দর মহলে থাকুন। তাঁর يدخل عليك البر و الفاجر বাক্যের মর্ম তা-ই।

সহীহ্ বুখারীতে হযরত আয়েশা (রা)-র রেওয়ায়েত মুতা যুদ্ধ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে যে, হযরত যায়েদ ইবনে হারিসা, জাফর ও আবদুল্লাহ্ ইবনে রাওয়াহা (রা)-র শাহাদাতের সংবাদ যখন মদীনায় পৌঁছে, তখন রসূলুল্লাহ্ (সা) মসজিদে উপস্থিত ছিলেন। তাঁর চোখেমুখে তীব্র দুঃখ ও কষ্টের চিহ্ন পরিস্ফুট ছিল। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আমি গৃহের ভিতর থেকে দরজার এক ছিদ্র দিয়ে এই দৃশ্য অবলোকন করছিলাম।

এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, হযরত আয়েশা (রা) এই বিপত্তির সময়ও বোরকা পরিধান করত বাইরে এসে সমাবেশে যোগদান করেন নি; বরং দরজার ছিদ্র দিয়ে সভাস্থল পরিদর্শন করেন।

'বুখারী কিতাবুল মাগাযী' 'ওমরাতুল কাযা' অধ্যায়ে হযরত আয়েশা (রা) ভগ্নীপুত্র ওরওয়া ইবনে যুবায়ের ও আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তাঁরা মসজিদে নববীতে হযরত আয়েশা (রা)-র কক্ষের বাইরে নিকটবর্তী স্থানে উপস্থিত ছিলেন এবং রসূলুল্লাহ্ (সা)-র ওমরা সম্পর্কে পরস্পরে বাক্যালাপ করছিলেন। ইবনে উমর (রা) বললেন, ইতিমধ্যে আমরা হযরত আয়েশা (রা)-র মেসওয়াক করার ও গলা সাফ করার আওয়াজ কক্ষের ভিতর থেকে শুনতে পেলাম। এ রেওয়ায়েত থেকেও জানা যায় যে, পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর নবী-পত্নীগণ গৃহে থেকে পর্দা করার নীতি অবলম্বন করেছিলেন।

অনুরূপভাবে বুখারীর তায়েফ যুদ্ধ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) পানির এক পাত্রে কুলি করে আবূ মূসা আশআরী ও বেলাল (রা)-কে তা পান করতে ও মুখমণ্ডলে লাগাতে দিলেন। উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালমা (রা) পর্দার আড়াল থেকে এই দৃশ্য দেখছিলেন। তিনি ভিতর থেকে আওয়াজ দিয়ে সাহাবীদ্বয়কে বললেন, এই তাবাররুকের কিছু অংশ তোমাদের জননীর (অর্থাৎ আমার) জন্যও রেখে দিও।

এ হাদীসটিও সাক্ষ্য দেয় যে, পর্দা অবতরণের পর নবী-পত্নীগণ গৃহে এবং পর্দার অভ্যন্তরে থাকতেন।

জ্ঞাতব্য ঃ এ হাদীসে আরও একটি প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, নবী-পত্নীগণও অন্যান্য মুসলমানের ন্যায় রসূলুল্লাহ্ (সা)-র তাবাররুকের জন্য আগ্রহান্বিত ছিলেন। এটাও রসূলুল্লাহ্ (সা)-র পবিত্র সত্তার বৈশিষ্ট্য ছিল। নতুবা স্ত্রীর সাথে স্বামীর যে অবাধ সম্পর্ক থাকে, তার পরিপ্রেক্ষিতে স্বামীর প্রতি এ ধরনের সম্মান ও ভক্তি প্রকাশ স্বভাবতই অসম্ভব।

বুখারীর কিতাবুল আদবে হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, একবার তিনি ও আবূ তালহা (রা) রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সাথে কোথাও গমনরত ছিলেন। রসূলুল্লাহ্ (সা) উটে সওয়ার ছিলেন এবং তাঁর সাথে ছিলেন উম্মুল মু'মিনীন হযরত সাফিয়া (রা)। পথিমধ্যে হঠাৎ উট হোঁচট খেলে তাঁরা উভয়েই মাটিতে পড়ে গেলেন। আবূ তালহা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে যেয়ে বললেন, আমার জীবন আপনার জন্য উৎসর্গ হোক, আপনি কোন আঘাত পাননি তো? তিনি বললেন, না। তুমি সাফিয়া (রা)-র খবর নাও। আবূ তালহা (রা) প্রথমে বস্ত্র দ্বারা নিজের মুখমণ্ডল আবৃত করেছেন, অতপর হযরত সাফিয়া (রা)-র কাছে পৌঁছে তাঁর উপর কাপড় রেখে দিলেন। তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং আবূ তালহা (রা) তাঁকে পর্দাবৃত অবস্থায়ই উটে সওয়ার করিয়ে দিলেন।

এই আকস্মিক দুর্ঘটনার মধ্যেও সাহাবায়ে কিরাম এবং নবী-পত্নীগণের পর্দার সযত্ন প্রয়াস এর গুরুত্বের প্রতিই ইঙ্গিত বহন করে।

তিরমিযী বর্ণিত হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রা)-এর বাচনিক রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন اذا خرجت المراة استشرفها الشيطان অর্থাৎ নারী যখন গৃহ থেকে বের হয়, তখন শয়তান তাকে তাক করে নেয় (অর্থাৎ তাকে অনিষ্ট সাধনের উপায় হিসাবে গ্রহণ করে)।

ইবনে খুযায়মা ও ইবনে হাব্বান এ হাদীসে আরও বর্ণনা করেন ঃ واقرب ما تكون من وجه ربها وهى فى قعر بيتها অর্থাৎ নারী তার পালনকর্তার সর্বাধিক নিকটে তখন থাকে, যখন সে তার গৃহের অভ্যন্তরে অবস্থান করে।

এ হাদীসেও সাক্ষ্য আছে যে, গৃহে অবস্থান করা এবং বাইরে না যাওয়াই নারীদের আসল কাজ। (প্রয়োজনের ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম।)

অন্য এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ ليس للنساء نصيب فى الخروج الا مضطرة অর্থাৎ নিরুপায় হওয়া ছাড়া নারীদের বাইরে যাওয়ার বৈধতা নেই।

হযরত আলী (রা) বর্ণনা করেন, আমি একদিন যখন রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে উপস্থিত ছিলাম, তখন তিনি সাহাবায়ে কিরামকে প্রশ্ন করলেন, اى شيئ خير للمراة অর্থাৎ নারীদের জন্য উত্তম কি? সাহাবায়ে কিরাম চুপ রইলেন—কোন জওয়াব

দলেন না। অতপর আমি গৃহে পৌঁছে ফাতেমা (রা)-কে এই প্রশ্ন করলে তিনি বললেন ঃ لا يرون الرجال ولا يرونهن অর্থাৎ নারীদের জন্য উত্তম এই যে, তারা পুরুষদেরকে দেখবে না এবং পুরুষরাও তাদেরকে দেখবে না। আমি তাঁর এই জওয়াব রসূলুল্লাহ্ (সা)-র গোচরীভূত করলে তিনি বললেন ঃ صدقت انها بضعة منى অর্থাৎ সে সত্য বলেছে। সে তো আমারই অংশ বিশেষ।

নবী-পত্নিগণ কেবল বোরকা চাদরের পর্দাই করতেন না—বরং তাঁরা সফরেও উটের পিঠে হাওদায় থাকতেন। হাওদায় উপবিষ্ট অবস্থায় তা উটের পিঠে তুলে দেওয়া হত এবং এমনিভাবে নামানো হত।

আরোহীর জন্য হাওদা গৃহের ন্যায় হয়ে থাকে। হাওদায় অবস্থানই অপবাদের ঘটনায় হযরত আয়েশা (রা)-র জঙ্গলে থেকে যাওয়ার কারণ হয়েছিল। কাফেলা রওয়ানা হওয়ার সময় হযরত আয়েশা (রা) হাওদায় আছেন—এই মনে করে খাদিমরা হাওদাটি উটের পিঠে তুলে দেয়। বাস্তবে তিনি তাতে ছিলেন না, বরং প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বাইরে গিয়েছিলেন। এই ভুল বোঝাবুঝির মধ্যে কাফেলা রওয়ানা হয়ে যায় এবং উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা) জঙ্গলে একাকিনী থেকে যান।

এ ঘটনাটিও এ বিষয়ের শক্তিশালী সাক্ষী যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) এবং তাঁর পত্নিগণ পর্দার অর্থ এটাই বুঝেছিলেন যে, নারীরা গৃহের অভ্যন্তরে থাকবে এবং সফরে গেলে হাওদার অভ্যন্তরে থাকবে। তাদের ব্যক্তিসত্তা পুরুষের সামনে পড়বে না। সফরে অবস্থানকালে পর্দার এই গুরুত্ব থেকে অনুমান করা যায় যে, বাড়িঘরে অবস্থানকালে কতটুকু গুরুত্ব হবে।

**দ্বিতীয় স্তর বোরকার মাধ্যমে পর্দা ঃ** প্রয়োজনের ক্ষেত্রে নারী গৃহ থেকে বের হলে কোন বোরকা অথবা লম্বা চাদর দ্বারা আপাদমস্তক আবৃত করে বের হওয়ার বিধান রয়েছে। এর প্রমাণ সূরা আহযাবের এই আয়াত ঃ

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ -

হে নবী! আপনি আপনার পত্নিগণকে, কন্যাগণকে এবং মুসলমানদের স্ত্রীদেরকে বলুন, তারা যেন 'জিলবাব' ব্যবহার করে। 'জিলবাব' সেই লম্বা চাদরকে বলা হয়, যদ্দ্বারা নারীর আপাদমস্তক আবৃত হয়ে যায়।

ইবনে জরীর হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে 'জিলবাব' ব্যবহারের প্রকৃতি এই বর্ণনা করেছেন যে, নারীর মুখমণ্ডল ও নাকসহ আপাদমস্তক এতে ঢাকা থাকবে